ঘরেতে ভ্রমর এলো

১৯৫০

বুদ্ধদেব বসু
প্রণীত

এক টাকা

প্রকাশক—শ্রীরমেন্দ্রকুমার শীল
১৬০, নিমুগোস্বামীর লেন,
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ
জুন, ১৯৩৫

প্রিণ্টার—শ্রীকুঞ্জবিহারী শীল
শ্রীকৃষ্ণ আর্ট প্রেস
৩২৯, অপার চিৎপুর রোড, কলিকা

ঘরেতে ভ্রমর এলো

বুদ্ধদেব বসু

প্রণীত

অন্যান্য উপন্যাস :

যেদিন ফুটলো কমল, আমার বন্ধু, ধূসর গোধূলি, হে বিজয়ী বীর, প্রেমের বিচিত্র গতি, শ্বেত পত্র, সূর্য্যমুখী, পরস্পর, অসামান্য মেয়ে, লাল মেঘ, রূপালি পাখি, বাড়ি-বদল

ঘরেতে ভ্রমর এলো

এসে বললে, 'ওগো, জগুবাবুর বাজারে নাকি গঙ্গার ইলিশ উঠেছে বড়-বড়। যাও না, একটা নিয়ে এসো গে। আর কী—ইলিশ মাছের দিন তো ফুরিয়েই এলো।'

ঠিক গুঞ্জন নয়, আত্মার উপর এ ঝরে না স্বর্গের শিশিরের মত। এর সুরে-সুরে আশ্বিনের নীল সকালবেলা বিহ্বল হ'য়ে ওঠে না।

মাথা তুলে বললুম, 'প্রিয়ে, চেয়ে দ্যাখো, তোমার চোখের মত আকাশ আজ নীল। সাদা মেঘগুলো ভেসে চলেছে—আমার মনের উপর দিয়ে তোমার স্বপ্নের মত। আর এই যে রোদ উঠলো সোনায় সোনা হয়ে—ভাবছি এ কি তোমারই প্রেম সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো?'

এখানেই থামতুম না—না, আমি নিশ্চয় জানি আরো কিছু বলতুম, কিন্তু হঠাৎ ভ্রমরের একখানা হাত আমার মুখের উপর এসে পড়লো। সে-হাতে নানারকম মশলার একটা মিশেল গন্ধে হঠাৎ রান্নাঘর ভিড় করে' এলো আমার

মগজের মধ্যে।—'আহা—থামো। ভালো লাগে না ন্যাকামি।'

ভ্রমরের হাতখানা মুখের উপর থেকে সরিয়ে নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললুম, প্রিয়ে, একবার তাকাও। জানলা দিয়ে তোমার ঐ চোখ দুটিকে ভ্রমরের মত একবার বাইরে পাঠিয়ে দাও। স্বর্গ আজ উন্মোচিত। উর্ব্বশীর ঝলোমলো আঁচল দুলছে হাওয়ায়। এমন সকালবেলা কি কাটাতেই হবে রান্নাঘরে, ইলিশ-মাছ নিয়ে?'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভ্রমর একটু মুচকি হাসলো। এ-কথা মানতেই হবে যে তার প্রকৃতিতে সহিষ্ণুতা আছে। আমার সম্বন্ধে, অন্তত। আমার এ-সব ন্যাকামি সে সহ্য করে—হাসিমুখে, যেমন আমরা সহ্য করি শিশুর প্রগল্‌ভতা। তাতে আছে একটু করুণা, আছে স্নেহ। প্রতিবাদ করবার দরকার নেই—কেননা শোনবার দরকার নেই। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ভ্রমরের জন্য।

ভ্রমর তার আধ-ময়লা সাড়ির স্খলিত আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে বল্‌লেঃ 'নাও, ওঠো। ন'টা তো বাজলো বলে'—তাড়াহুড়ো লাগবে একটু পরেই।'

'তাড়াহুড়ো? কিসের?'

ভ্রমর আমার দিকে একটা তীব্র কটাক্ষক্ষেপ করে' ঠোঁট বাঁকালো।

'পাগল! আজ ইস্কুলে যাবো নাকি ভেবেছো?'

'না, তা কি আর যাবে? রোজই তো একবার বলো ও-কথা। তারপর দশটা যেই বাজতে থাকে—তোয়ালে কই? সাবান কই? ভাত কই? জুতো কই? পান কই? একটু হুলুস্থুল বেধে যায়। সময় থাকতে একটু আস্তে-আস্তে নেয়ে-খেয়ে নিলে কী হয়? আমি একা কত দিক সামলাতে পারি! আমাকে জব্দ করতে তোমার খুব ভালো লাগে, না?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করলুম। হায়রে, এক দিন ইস্কুল কামাই করবার ক্ষমতা যে আমার আছে, আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত তা বিশ্বাস করে না। উচ্ছন্নে যাবার আর দেরি কত?

'যাও না একটু বাজারে,' ভ্রমর বলতে লাগলো, দু মিনিটেরই তো ব্যাপার। ছোট দেখে একটা চ্যাপ্‌টা-মত মাছ এনো—বুঝলে? বরফ-চাপা মাছ খেয়ে-খেয়ে অসুখ নাকি তোমারই করে। টাটকা মাছ নিজে গিয়ে আনবে না তো কী হবে?'

তাই তো। কী হবে? কী করে' টাটকা মাছ সংগ্রহ হ'তে পারে, এ-সমস্যাও জীবনে কিছু কম নয়। উঠে দাঁড়ালুম।

আমাকে কলমটা ড্রয়ারে ভরে' রাখতে দেখে ভ্রমর বললে: 'লিখেছিলে নাকি?'

তাড়াতাড়ি প্যাডটা চাপা দিয়ে বললুম : 'ও কিছু নয়।'

'দেখি না, দেখি না একটু।' ('খোকা, একটা লজঞ্চুস নেবে?' আমি যে বাজারে যেতে রাজি হয়েছি, তার পুরস্কার হিসেবে দস্তুরমত আমার লেখা সম্বন্ধে একটু উৎসাহী হওয়া যায়।) ভ্রমর তাড়াতাড়ি কাগজটা টেনে নিলে। একটা সনেটের প্রথম চার লাইন লিখেছিলুম—কবে, কতদিনে এবং কেমন করে' বাকি দশ লাইন লিখবো সেটা এখন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের দয়ার উপর নির্ভর করছে।

কিন্তু সত্যি আমার লেখার উপর ভ্রমরের যাকে বলে সিম্পথি, আছে। খুব বেশি। লেখাপড়া সে বেশিদূর করেনি, কিন্তু তার সহজ বুদ্ধির গুণে সে বুঝেছে যে মাঝে-মাঝে মাসিকপত্রে আমার যে দুটো-একটা কবিতা বেরোয়, তা ভয়ঙ্কররকম ভালো। সে আমার টেবিল রোজ দু' বেলা এমন নিখুঁতভাবে গুছিয়ে রাখে যে আমার ছেলে-বেলাকার কথা মনে পড়ে' যায় যখন লেখাপড়া ব্যাপারটা ছিলো টেবিল গুছোবার উপলক্ষ্য। আমি যদি কখনো রাত জেগে লিখি কি পড়ি সে আমার শুতে আসবার জন্য আব্দার করে না। ঘরে আলো জ্বলে বলে' তার যে ঘুমোবার অসুবিধে হয় এমন কথাও তার মুখে শুনিনি কখনো। হয়-তো সত্যি-সত্যি হয় না। তবু, নালিশ করবার এমন একটা সঙ্গত উপলক্ষ্য পেয়েও যে ছেড়ে

দেয়, তাকেই তো মহৎ বলে। আপনারা—যাঁরা এখনো বিয়ে করেন নি, আপনাদের চুপে-চুপে বলছি যে বিয়ে যদি করতেই হয় তো ভ্রমরের মত মেয়ে।

ভ্রমর কাগজটা সযত্নে চাপা দিয়ে বলে' উঠলো 'বাঃ!' ('বাঃ, খোকা, বাঃ। চকোলেট নেবে, চকোলেট?')

আমি গায়ে একটা পাঞ্জাবি চড়াতে-চড়াতে বললুম, 'কোথায়, দাও পয়সা।'

ভ্রমর আমার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললে, 'সত্যি কী চমৎকার পদ্য তুমি লেখো। এত ভালো আর কোনো পদ্যই আমার লাগে না।'

হঠাৎ আমি হো-হো করে' হেসে উঠলুম।

'কী হ'লো?'

'না, কিছু নয়। দাও পয়সা। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে। একটা ছোট এবং চ্যাপ্টা-মত ইলিশ আনতেই হবে।'

* *
*

ইস্কুলে যাবো না বলে' যে শাসিয়েছিলুম সেটা অবিশ্যি নেহাৎই ফাঁকা বুলি। না-গেলে দুটো টাকা লোকসান। বছরে বারো দিন স-মাইনে ছুটি মেলে, তা খরচ করে'

ফেলেছিলুম জানুয়ারি মাসের মধ্যেই। শীতকালে ঘুম থেকে উঠতে দেরি হ'তো; কান্না পেতো দশটার সময় স্নান করবার কথা ভাবলে। ভবিষ্যতের কথা ভেবে দেখিনি। সমস্ত বর্ষাটা ইস্কুল করেছি—ভিজেছি গড়পড়তা সপ্তাহে দু'দিন; ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় চারদিন পড়ে' ছিলুম, ভাগ্যিস্ তার মধ্যে একটা রবিবার ছিলো, দুটো টাকা বাঁচলো তবু। জীবনটা সর্দ্দি-আতঙ্ক হ'য়ে উঠেছিলো, ভ্রমর মাঝে-মাঝে রাত্তিরে শোবার সময় পায়ে গরম সর্ষের তেল মালিশ করে' দিতো বলে' বেঁচে ছিলুম। জয় হোক্ ভ্রমরের।

মাঝে-মাঝে থামকা তবু কামাই করেছি। নেহাৎই গায়ের ঝালে; কাটো না বাপু—মাইনেই তো কাটবে; এর বেশি আর কী? যাবো না, কিছুতেই যাবো না; কী করতে পারো? খাটের উপর (বিয়ের) চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে কর্ত্তাদের মুণ্ড-চর্ব্বণ করেছি; সময় কাটাবার পরম উপাদেয় উপায়, মানতেই হবে। কিন্তু গেলো মাসখানেক ধরে' রোজ হাজিরা দিচ্ছি। পূজোর মাসে খরচ আছে। এক টাকা কম মানে এক টাকা কম। আজও, ভ্রমরের চমৎকার রান্নার ইলিশ মাছ খেয়ে, ভ্রমরের সাজা চমৎকার পান চিবোতে-চিবোতে ছাতাটি (বিয়ের) মাথার উপর খুলে বেরিয়ে পড়লুম। আর কী—আর তো দু'দিন মোটে পূজোর ছুটি তো এসেই পড়লো।

* *

*

এই লেখার ষ্টাইলের সৌন্দর্য্য ইত্যাদি লক্ষ্য করে' কোনো বুদ্ধিমান পাঠক হয়-তো ভেবে অবাক হচ্ছেন যে আমি ইস্কুলমাষ্টারি করছি। কিন্তু আমি নিজে অবাক হয়েছিলুম চাকরিটা পেয়ে। আশা করিনি, সত্যি বলতে। অ্যাড্‌ভান্স্‌ আর অমৃতবাজারে দু'দিন বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিলো; বাঙলা দেশের বিভিন্ন সহর ও মহকুমা, গঞ্জ ও গ্রাম থেকে সাতাশিটা দরখাস্ত পড়েছিলো—সংখ্যাটা ঠিক মনে আছে। তার মধ্যে আমি কোথায়? আমার অবশ্যি আছে পয়লা নম্বরের ডিগ্রি; কিন্তু সেটাকে ভালো করে' দাঁড় করাতে পারি এমন সুপারিশের জোর ছিলো না। অন্য অনেকের সেটা ছিলো—খুব ভারি ওজনের। তা ছাড়া, এ-পর্য্যন্ত আমার যা-কিছু 'অভিজ্ঞতা' সবই জীবনের ব্যাপারে, ছেলে-পড়ানোর দফাটা ফর্দ্দির মধ্যে ছিলো না। ভরসা করবো কী বলে'? তবু যে চাকরিটা আমারই কাছে এলো শেষ পর্য্যন্ত, তা বলতে হয় নেহাৎই কপালের জোরে—মানে ভ্রমরের কপালের জোরে, যে তখন পিতৃগৃহে পিয়র্সের সাবান,

ওটিন, গানের ওস্তাদ, শরৎবাবুর নভেল, মাসে দুটো ফিল্‌ম্‌ ইত্যাদির সাহায্যে আমার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো। চাকরি খুঁজতে-খুঁজতে মরীয়া হ'য়ে গিয়ে হঠাৎ বিয়ে করে' ফেলে-ছিলুম। বাঙ্‌লাদেশে স্ত্রী খুঁজতে হয় না, স্ত্রী হয়। আমার এক পিসিমা বলেছিলেন আমি নেহাৎ অপয়া, আমার নিজের কপালে কিছু হবে না, ভাগ্যের মুখ ফেরাবার জন্যই আমার এখন বিয়ে করা দরকার। অবাক হ'য়ে গিয়েছিলুম তাঁর দূরদৃষ্টিতে। যা-ই হোক, ভবসমুদ্রে ভেসে থাকবার মত একটা অবলম্বন যে পাওয়া গেছে, এ-জন্যই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। টাকা? পৃথিবীতে সকলেরই যে টাকা হ'তে পারে না, এ-কথা ভ্রমরও বোঝে—এবং আমাকে বোঝায়। আর কাজের কথাই যদি বলো, সংসারে কোন্‌ কাজটা করতেই বা আনন্দ হয়। থার্ড ক্লাশে একজন থার্ড ক্লাশ জীবিত বাঙালি কবির ছুঁতে-ঘেন্না-করে এমন পদ্য পড়াতে-পড়াতে—আমি যে মোটের উপর বেশ ভালোই আছি, এই কথাটা মন্ত্রের মত জপ করতে থাকি। কিন্তু তাতেও বাধা পড়ে। পাশেই নিচের দিকের একটা ক্লাশ, মাঝখানে পাৎলা কাঠের একটা পার্টিশন মাত্র। আট-দশ বছরের ছেলেরা প্রশান্তি ও গাম্ভীর্য্যের দৃষ্টান্ত নয়—গোলমাল হয়। আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর আমারই কানে ডুবে যায়—তাতে যা-হোক্‌ একটু শান্তি পাই মনে।

যে-আমি একদিন কবি হবার স্বপ্ন দেখেছিলুম, বাঙলা-ভাষার নিকৃষ্টতম রচনার কতগুলো নমুনা পড়িয়ে দিনযাপন করি। ইস্কুলে, শুনতে পাই, আমার নাম হয়েছে। এক-কালে জ্যোতিষ-শাস্ত্রের চর্চ্চা করেছিলুম, আমার হাতের খ্যাতিরেখা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ ছিলো না। কিন্তু ভাবতে পারিনি, সে-খ্যাতির মানে যে এই!

প্রতি মুহূর্ত্তে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছা করে, ভ্রমর বিধবা হবে ভেবে অতি কষ্টে নিজেকে নিবৃত্ত করি। কলেজে যখন পড়তুম, নিজের ভবিষ্যৎকে দেখেছিলুম দুরাশায়, দুঃসাহসে দিগন্ত থেকে দিগন্তে ঝলোমলো। আজ সে-দিগন্ত ছোট হ'তে-হ'তে এসে ঠেকেছে এই ইস্কুলের দেয়ালে, ভ্রমরের আধ-ময়লা সাড়ির আঁচলের সীমায়। এর নাম জীবন।

* *
*

অনেকদিন ভেবেছি চাকরি ছেড়ে দেবো, আর ভাবতে ভালো লাগে না। একদিন সয়ে' যাবে, একদিন আর গায়ে কিছু লাগবে না। এ-ই আশা। হ্যাঁ, এ-ই আশা—কিন্তু এ-ই তো দুঃখ, এ-ই তো সব চেয়ে বড় দুঃখ যে একদিন কিছুই আর গায়ে লাগবেনা।

বছরখানেক কাজ করছি, এরই মধ্যে শিথিল হ'য়ে এসেছে স্বভাব। মানুষের মন সহজে মরে না। প্রথমটায় অনেক-কিছু ভেবেছিলুম—ছেলেদের মনে সাহিত্য রস সঞ্চার ইত্যাদি। পাগলামি! চিঁড়িয়াখানার শিম্পাজির ঘরে বসে রবীন্দ্রনাথ পড়া। মাথায় থাকুন রবীন্দ্রনাথ। মাথায় থাক সাহিত্য-রস। আমার মাইনে পাওয়া নিয়ে কথা।

* *
*

কর্তারা তা চান না, তা ছাড়া। তাঁরা চান্ যে-কোনো রকমে আমি কোর্স্ শেষ করবো। কাজের ওজন বোঝেন তাঁরা। কোর্স শেষ করে' চলি। ঘোড়দৌড় আবার কী—ঐ যথেষ্ট। যে-সব জিনিস পড়াতে হয় তার জন্য আধ মিনিট অতিরিক্ত সময় খরচ করাও আত্মার অপমান। এমনও নয় যে আধ মিনিট অতিরিক্ত সময় পাই। বছরে চারটে পরীক্ষা; প্রতিবার আড়াইশোর মত খাতা দেখতে হয়। প্রথম বারই কষ্ট হয়েছিলো। তার পরেই শিখে গেলুম। ছেলেটির নাম পড়ি, চেহারা মনে করবার চেষ্টা করি (সব নাম কি চেহারা মনে রাখা মানুষের অসাধ্য), এখানে-ওখানে পড়ি দু'একটা লাইন, নম্বর বসিয়ে

যাই। জল। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, অনুমান ভুল হয়নি— কী-রকম একটা প্রবৃত্তি জন্মে' যায়। অভিজ্ঞতা।

আশ্বিনের সোনালি রোদের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এ-সব কথা ভাবছিলুম। ভ্রমরের কথা ভাবছিলুম। আমার চার-লাইন-লেখা সনেটের কথা ভাবছিলুম। ভালো হয়নি। কেনই বা লিখতে যাওয়া? কেন? নিজেকে নিজেরই কাছে প্রতিষ্ঠা করতে—সংসারের মুখে, ইস্কুলের মুখে, পৃথিবীর জীবনের মুখে। প্রাণ কি সহজে মরে। মাঝে-মাঝে বিদ্রোহ করে' বলে' উঠতে চায়, 'এখনো আমি আছি। তা ছাড়া আর কী?

কিন্তু একদিন আমার লেখা আসতো। একদিন সত্যি আমি কবি ছিলুম। সে কবে—কোন্ জন্মে, কোন্ জগতে, অতীতের কোন্ অস্পষ্টতায়। সেদিন, যার চোখের দিকে তাকিয়ে সুরে-সুরে আমার সমস্ত হৃদয় উচ্ছল হয়ে উঠেছিলো, তারই দৃষ্টি কি ছড়িয়ে আছে আজকের এই আশ্বিনের আকাশে?

* *
*

খুব আস্তে-আস্তে, অনেকক্ষণ ধরে' নাম ডাকলুম। বড় নাম, বেশ খানিকটা সময় নিলে। তবু, যথেষ্ট সময় যেন

নিলে না। ছেলেদের মনও চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে ছুটির এত কাছাকাছি। তারা উস্‌খুস্‌ করছে, কথা বলছে ফিস্‌ফিস্‌ করে'। দু' একজন দু' একটা অবান্তর কথা জিজ্ঞেস করছে, সংক্ষেপে উত্তর দিচ্ছি। বুঝতে পারছি তাদের ইচ্ছা আমি এই ঘণ্টাটা কাটিয়ে দিই গল্প করে'। এ-ইচ্ছা তাদের মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়। কিন্তু না—তাদেরকে মানুষ বলে' স্বীকার করলে চলবে না। তারা সুবিধে নিতে আরম্ভ করবে। এরা ছেলেমানুষ, এরা বর্ব্বর। এরা ধমক বোঝে, কান-মলা বোঝে; ভদ্রতা বোঝে না, প্রীতি বোঝে না। শিশুকাল থেকে এইভাবেই তাদের বোঝানো হয়েছে। ফিরে ফিরতি, আমিও ভোল বদ্‌লাতে বাধ্য হয়েছি এদের কাছে এসে। দোষ দেবো কার? বিষাক্ত চক্রের আরম্ভ কোথায়?

প্রথমটায় বেশ একটু কষ্ট হয়েছিলো এদের পোষমানাতে। বয়েস আমার অল্প। দেখতে, গতানুগতিক ইস্কুলমাষ্টার-মূর্ত্তির তুলনায়, নেহাৎ কাঁচা। মুখের হাসিখুসি ভাবটা সাম্‌লাতে পারতুম না কিছুতেই। ছেলেরা বাঁদ্‌রামি করতো। টানলুম মুখোস। কী ভয়ানক গম্ভীর, চোখের পলক পড়ে না। যেন সব সময় চটে' আছি। সামান্য অছিলায় দেখতে-একটু-ছেলেমানুষ গোছের কয়েকটা ছেলে বেছে-বেছে শাস্তি বিতরণ করলুম। ফল পেলুম আশ্চর্য্য। ছেলেরা মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস পায় না। সেই

মুখোস এখন আর খসাতে পারিনে, ইচ্ছে করলেও পারিনে। ওটা মুখের উপর এসে' গেছে। ক্লাশে ঢুকলেই কী-রকম সুড়সুড় করে' নেমে আসে, নিজেই টের পাইনে। একদিন হয়-তো সেটাই কায়েমি হ'য়ে পাকা হ'য়ে বসবে মুখের উপরে। তা তো হবেই—ভেবে কী লাভ?

না, গল্প করলে চলবে না। আমাকে পড়াতেই হবে আশুবাবুর শ্লাঘাজনক জীবন-চরিত। ছেলেরা ভাবুক আমার ভিতরটা কোনোখানে এতটুকু কাঁচা নয়। গলা-খাঁকারি দিয়ে বই খুললুম। একবার চোখ গেলো বাইরে। সহরের ছাদের ঢেউয়ের উপর দিয়ে খানিকটা আকাশ যেন উত্তাপে আলস্যে দীপ্তিতে মূর্চ্ছিত। আমি করছি কী? সোনালি-নীল স্বপ্নের মত এই দিন কি আমাকে কাটাতেই হবে আশুবাবুর জীবন-চরিত পড়িয়ে? কিন্তু কোর্স শেষ না-করলে চলবে কেন? ডিউটি।

চোখ ফিরিয়ে এনে নিবদ্ধ করলুম বইয়ের পৃষ্ঠায়। আরম্ভ করলুম। সমস্ত ঘরের স্তব্ধতার মধ্যে আমার একঘেয়ে, একটানা কণ্ঠস্বর। আশ্চর্য্য—ওরা কেউ আমাকে গলা টিপে মেরে ফেলে না কেন?

আর হঠাৎ, ঘরের মধ্যে আর-একটা শব্দ। তাকিয়ে দেখলুম, মস্ত বড় এবং কুচকুচে কালো একটা ভ্রমর পিছন দিককার জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছে। মেলে দিয়েছে

পাখা, অঙ্কের মত ছোট-ছোট চক্র এঁকে ছেলেদের মাথার উপর ঘুরছে। গুঞ্জনে ভরে' গেলো ঘর ভরে' গেলো আকাশ, সমস্ত বিশ্ব। কোনোখানে আর-কিছু নেই, এই গুঞ্জনে চিরকাল বাণীময়। আমার চোখের সামনে ক্লাশঘরের দেয়ালগুলো দূরে সরতে-সরতে দিগন্তে মিলিয়ে গেলো, হারিয়ে গেলো ছেলেদের মুখ—তারপর রাত্রি, ঘরে নীলাভ লঘু অন্ধকার, বাইরে আকাশ ভরে' জ্যোছনা। জানলার ধারে সে বসে'। একটা পেয়ারা গাছের পাতার ভিতর দিয়ে ছায়ার জালি-কাটা জ্যোছনা এসে পড়েছে তার চুলে, তার ঠোঁটে, টেবুচা হ'য়ে তার বুকের উপর। রক্ত কল্লোলিত সমুদ্রের জোয়ারের মত; হৃৎপিণ্ড আছাড় খেয়ে মরছে মাংসের দেয়ালে।

'এত দেরি করলে কেন?'

কথা বলতে আমার যেন ভয় করছিলো। তার চুলের আর ঠোঁটের আর শিথিল বাহুর দিকে তাকিয়ে চুপ ক'রে রইলুম।

বিদ্যুৎময় স্তব্ধতা। সে মাথা নিচু করলো, যেন সে-ও সাহস পাচ্ছে না আমার চোখের দিকে তাকাতে, পাছে ভয়ঙ্কর রহস্যময় আগুন জ্বলে' ওঠে দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টির ঘর্ষণে। তার চুলের ভাগরেখা জ্যোছনায় আভাময় হ'য়ে উঠলো, যেন বহুদূরের দুঃসাহসের কোনো পথের ইঙ্গিত।

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ?' হাওয়ায় নিশ্বাসের স্বর ভেসে এলো, 'কোথায় ছিলে? আমার যে কী কষ্ট হয় তা কি বুঝতে পারো না? কেন—কেন তুমি ভালোবাসলে আমাকে? তোমাকে ছেড়ে আমি কী করে' বাঁচবো?'

রুদ্ধস্বর বেজে চললো, নরম, অর্দ্ধস্ফুট, রাত্রির হৃদয়ের কোনো নর্ম্মরের মত। তারপর তা স্ফীত হ'য়ে উঠতে লাগলো, একটা সংহত ধ্বনি, কথাহীন একটা গুঞ্জন—আমার কানের কাছে এই ভ্রমরের উচ্চ সানন্দ গুঞ্জনের মত। ভ্রমরটা ঠিক আমার মাথার উপর দিয়ে চঞ্চল পাখা নাড়তে-নাড়তে উল্টোদিকের জানলা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

—ইম্পর্টণ্ট্ প্যাসেজগুলো একটু দাগ দিয়ে দেবেন, স্যর?

কেলেঙ্কারি

দু'বন্ধুতে দেখা অনেকদিন পর। এককালে, কলকাতায়, এদের সাহচর্য ছিলো প্রায় নিরবচ্ছিন্ন। মণিলাল তখন তার মামার আপিসে নবিশি করে। আপিসে যাবার অছিলায় সে বাড়ি থেকে বেরুতো, তারপর প্রশান্তর ওখানে গিয়ে সারা দুপুর ঘুমোতো। বাড়ি ফিরতো সেই রাত এগারোটায়। ইতিমধ্যে হ'তো দু'জনে—হাজার কথা—তার বেশিরভাগ যাকে বলে বাজে কথা। কিন্তু সময়টা কাটতো ভালো, হাসিতে গল্পে প্রফুল্লতায় স্বাস্থ্য ভালো থাকতো। অনেক সুখ একসঙ্গে তারা নিয়েছে, কিছু-কিছু দুঃখ পেয়েছে একসঙ্গে। খাওয়া আর বেড়ানো, উত্তেজনা আর অবসর, প্রমোদ আর প্রশান্তির লক্ষ ছোট-ছোট সুরের ভিতর দিয়ে দু'জনের জীবন একসঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু এ-রকম চিরকাল কাটতে পারে না, তারা জানতো ; তারই আশঙ্কার ছায়া পড়তো মাঝে-মাঝে—কোনো হোটেলের উজ্জ্বল আলোর নিচে কি বাস্-এ যেতে-যেতে আলাপের

বিরতির ফাঁকে। অদৃষ্ট আমাদের মনের ইচ্ছাকে খাতির করে না, তারা জানতো। আর তা-ই তো হ'লো—প্রশান্তকে চলে' যেতে হ'লো আগ্রায়, একটা চাকরি নিয়ে। কাজটা দালালি গোছের, ছুটি-ছাটা নেই। ঘুরে বেড়াতে হয় বেশির ভাগ সময়। এদিকে মণিলালও তার মামার আপিস থেকে বেরিয়ে অন্য এক আপিসে ঢুকলো: এখন আর প্রশান্ত নেই, যার বাড়ি গিয়ে দুপুরবেলা ঘুমোনো যায়, আর থাকলেও স্বাস্থ্যরক্ষার ঐ বিধান মেনে চলা সম্ভব হ'তো না—মাসের শেষে মাইনেটার বড় দরকার।

তিন বছর পর দু'জনের দেখা। চিঠি লেখালেখি প্রথম কয়েক মাস চলেছিলো—কিন্তু বছরের প্রতিটিদিন যাদের আট-দশ ঘণ্টা করে' পরের খাটনি খাটতে হয়, নিজের চিঠিপত্র তারা কতকাল আর লিখতে পারে! একটা ব্যতিক্রম হয়েছিলো মণিলালের বিয়ের সময়। সে তখন বন্ধুকে বেশ লম্বা গোছের একটা চিঠি লিখেছিলো—যদি সে দু'দিনের জন্যেও আসতে পারে। প্রশান্ত করাচি থেকে ফিরে এসে সে-চিঠি যেদিন পেলে, তার আগের দিন বিয়ে হ'য়ে গেছে। ঠিক সময়ে পেলে হয়-তো আসতো—অন্তত চেষ্টা করতো আসতে। তা যখন হ'লো না, লম্বা চিঠির সঙ্গে ছোট একটা চেক্ পাঠিয়ে দিলে—'স্ত্রীকে যা হয় কিছু কিনে দিয়ো, এমন পোড়া দেশ, মনের মত কিছু যদি পাওয়া যেতো!'

মণিলাল লিখেছিলো উত্তরে : 'তোমার টাকা আমার কাছে জমা রইলো, তুমি আবার যখন কলকাতায় আসবে, একসঙ্গে খরচ করবো।'

এই তাদের মধ্যে শেষ চিঠি। তারপরে বছরখানেক কেটেছে। মণিলাল, আপিস-ফেরতা, নির্জ্জীব, সিগ্রেটের ধোঁয়ায় ঝাপসা, ইজিচেয়ারে শুয়ে-শুয়ে স্ত্রীর নির্ব্বাচিত রেকর্ড শোনে, Vogue নামক বিলিতি ফ্যাসানের কাগজের পাতা ওল্টায়, মাঝে-মাঝে স্ত্রীর সঙ্গে আত্মীয়দের চরিত্রের বিচিত্র দুর্ব্বলতা নিয়ে আলোচনা করে। আর প্রশান্ত ঘুরে বেড়ায় কোথায় ইন্দোর, আর কোথায় বোম্বাই আর কোথায় ত্রিচিনপলি, আপিসের কাজ নিয়ে, পরের জিনিস পরের কাছে বেচে মাঝখানে মোটা মুনফা কুড়োয়, রেলগাড়িতে যেতে-যেতে গোয়েন্দা-নভেল পড়ে, চৌরঙ্গির উপর দিয়ে লাল দমকল দারুণ বেগে ছুটেছে এই স্বপ্ন দেখতে-দেখতে চমকে উঠে দেখে গাড়ি বড় একটা জংসনে এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রশান্ত, আগের চাইতে বেশ একটু মোটা, চুলে সায়েবি ছাঁট, মুখ লালচে, সেদিন সকালবেলায় প্রশান্ত যখন এলো, মণিলাল দাড়ি কামাবার উদ্যোগ করছে। পূর্ব্বকালে দাড়ি কামানো সম্বন্ধে সে অত্যন্ত শিথিল স্বভাব ছিলো। তিন চারদিন নিরুদ্বেগে দাড়ি গজাতে দিয়ে হঠাৎ একদিন নানা রকমের বাটি ও প্রসাধনের জিনিস সাজিয়ে বসে পুরো আধ

ঘণ্টার পরিশ্রমে মুখখানাকে একেবারে আয়নার মত করে' তুলতো। আসল ব্যাপারটা তেমন-কিছু নয়, কিন্তু তার তোড়জোড়ের কথা ভাবলেই তার কান্না পেতো। সত্যি বলতে, সেই সময়ে এটা ছিলো তার জীবনের সব চেয়ে গুরুতর ও কষ্টকর কাজ। কতবার সে বলেছে যে এটাই হচ্ছে পুরুষের উপর প্রকৃতির প্রতিশোধ, পুরুষকে যে সন্তান বহন করতে হয় না তার বদলে এই ক্ষৌরকার্য্য তার শাস্তি। চাকরি ব্যাপারটাতে সব চেয়ে তার যেখানে আপত্তি, তা এই প্রাত্যহিক আবশ্যিক ক্ষৌরকার্য্যে। অন্য সব ধা-ক্কা ক্রমে স'য়ে যায়, শুধু এই ব্যাপারটা এতদিনেও তার ঠিক গা-সহা হ'লো না।

যা না-করলেই নয়, তা করতেই হবে। সেদিন সকাল-বেলায় (যেমন তার আজকালকার জীবনের অন্য সব সকাল বেলায়), যখন সে চা খেয়েছে এবং খবরের কাগজে সিনে-মার বিজ্ঞাপনগুলোর উপর চোখ বুলিয়েছে, সে উঠে দাঁড়ালো, তারপর দাড়ি কামাবার বিভিন্ন বাটিগুলোকে হাতের কাছে সংগ্রহ করতে লাগলো। এমন সময় চাকর এসে একজন বাবুর আবির্ভাব ঘোষণা করলে। নিশ্চয়ই তার মামাতো ভাই অমরেশ আবার কাউকে বাঙলা বইয়ের জন্যে তার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে (ছেলেটাকে একদিন কড়া কথা না-বললেই চলবে না), এই মনে করে' সে বাইরে এলো, এসে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো।

—'আরে, তুমি !'

'এই তো, এলুম' প্রশান্ত মুচকি হাসতে লাগলো।

'কবে এলে ? কোথায় উঠেছো ? ক'দিন থাকবে ? আগে চিঠি লেখোনি কেন ?' মণিলালের কথার খেই প্রায় হারিয়ে গেলো—'এসো, এসো, তারপর সব শুনবো।'

উপরে-উঠতে উঠতে প্রশান্ত বললে, 'যাক্, সেই বাড়িতেই আছো তাহ'লে ?'

'ভাগ্যি ! যদি বাড়ি বদল করতুম, হয়-তো দেখাই হ'তো না।'

'তা কী হয় ! খুঁজে বা'র করে' নিতুম ঠিক।'

উপরে সামনের ঘরটায়, নানারকম ভদ্রোচিত আসবাবে সাজানো, দু'জনে বসলো। খানিকক্ষণ তারা চুপ করে' তাকিয়ে রইলো পরস্পরের দিকে, কিছু বললে না।

'আবার কলকাতা !' প্রশান্ত খানিক পরে বললে।

'উঃ, কী করে' ছিলে এতদিন ঐ ঈশ্বরপরিত্যক্ত দেশে !'

'ছিলুম আর কি !'

মণিলাল বন্ধুর সমস্ত শরীরের উপর একবার চোখ বুলিয়ে বললে, 'বেশ গোলগাল হয়ে' উঠেছো যা হোক্।'

'তোমাকেও তো কৃশ দেখছি না।'

'আর বলো কেন—হাঁটা-চলা নেই, সারাদিন ঠায় একটা চেয়ারে বসে' থাকা। ভুঁড়ি হলো' বলে'।—তোমাকে কি এখানে—বদলি করলে ?'

প্রশান্ত মাথা নাড়লো।

'অমন সৌভাগ্য কি আমার হবে! ওদের কাজ নিয়েই এসেছি।'

মণিলালের মুখে একটা ছায়া পড়লো।—'কিছুদিন আছো তো?'

'পরশুই চলে' যাচ্ছি।'

'পরশু!' মণিলালের মুখের ছায়া গভীরতরো হ'লো।—'দু'দিনের জন্য না-এলেও পারতে।'

'মন্দ কী? তবু তো দেখা হ'লো। কী খবর সব বলো।'

'খবর?' মণিলাল অবাক হ'য়ে গেলো যে তার জীবনের কোনো খবর নেই। এই তিন বছরে তার জীবনে এমন কিছু ঘটেছে বলে' সে মনে করতে পারলে না যা বলা যায়। 'বেশ ভালোই আছি,' একটু চুপ করে' থেকে সে বললে।

'তা তো দেখতে পাচ্ছি। ক্ষিতীশ এখন কোথায়?'

খানিকক্ষণ তারা অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে আলাপ করলে। তাদের কেউ রংপুরে চিনির কারখানায় চাকরি নিয়ে গেছে, কেউ মুন্সেফি করছে মুর্শিদাবাদে, কেউ বা আছে কলকাতাতেই, নোট লিখছে, মাঝে-মাঝে দেখা হয়।

ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে, দরজায় লতা-আঁকা

পরদা দেয়ালে ছবি (হবেমা-র অ্যাভিনিউ ক্লরেন্সের রাস্তায় সখীদের নিয়ে হেঁটে চ'লে'-যাওয়া বিয়াত্রিচের দিকে তাকিয়ে-থাকা দান্তে টিশিয়ানের ভিনাস ও অ্যাডোনিস ইত্যাদি). ছোট টেবিলের উপর এক ঝাঁক ইংরিজি বাংলা মাসিকপত্র, দেয়ালের কোণে কালো বার্নিশ-করা গ্রামোফোন—এ-সমস্ত, এবং এ-সমস্ত জড়িয়ে যে-মনোভাব জীবনকে গ্রহণ করবার যে-নির্দ্দিষ্ট ভঙ্গি—তা লক্ষ্য করে' প্রশান্ত বলে' উঠলো.

'বাঃ, দিব্যি ফিটফাট দেখছি।'

এবং এই কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গে দু'জনের মধ্যে যেন ফিরে এলো সেই পুরোনো স্রোত। নানা কথার মধ্যে এতক্ষণ সে-সংস্পর্শ তারা খুঁজে পাচ্ছিলো না তা ফিরে এলো এই অত্যন্ত ছোট আপাততুচ্ছ কথায়। মণিলালের মুখে লাগলো আভা পরিচয়ের—এতক্ষণে সে যেন তার বন্ধুকে চিনতে পারলে। তার চোখে একটা দুষ্টু রকমের হাসি ঝলমল্ করে' উঠলো।

'ওঃ, লাবণ্যর ভয়ানক খুঁৎখুঁতে রুচি।'

'তোমার স্ত্রী?'

'তা ছাড়া আর কে? শ্বশুরমশাই অনেক যত্নে মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন।'

'প্রকৃতিতে একটা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা আছেই। নিজে তো একটা মূর্খ হ'য়ে কাটালে চিরকাল।'

'সে কথা এখন আর বোলো না। কত যে বই পড়েছি যদি জানতে! সেই যে রাসেল্ না কী, যার বই আজকাল সবাই পড়ে'

প্রশান্ত হো-হো করে' হেসে উঠলো।

যেন গানের একটা ঝরনা মণিলালের বুকের উপর দিয়ে বয়ে' গেলো। কতদিন এ-রকম হাসি সে শোনেনি। কতদিন এ-রকম করে' সে হাসেনি। পৃথিবীর এত সমস্ত জিনিস—টাকা, আপিসে যাবার মুখে ট্র্যামের ভিড়, গ্রামোফোনের রেকর্ড, আত্মীয়দের হীনতা, স্ত্রীর পাশে বসে' দেখা সিনেমার ছবি, মাঝ-রাতে পাশের ফ্ল্যাটে শিশুর দুর্দ্দান্ত চীৎকার—এ-সমস্তর মধ্যে এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিলো এই সরল, এই সহজ, এই উচ্ছ্বসিত, উত্তপ্ত হাসি। স্মৃতির ঝরনা যেন বয়ে' গেলো মণিলালের বুকের উপর দিয়ে—হঠাৎ একসঙ্গে কত কথা তার মনে পড়লো।

'বাঃ, সত্যি-সত্যি রাসেল্ পড়েছি যে', আবার সেই হাসি শোনবার আশায় মণিলাল বললে। 'এমন কি, সম্প্রতি বিলেতে যে দারুণ এক লেখকের আবির্ভাব হয়েছে—হাক্স্‌লি না কী নাম, তারও—

প্রশান্ত চেয়ারের পিঠে মাথা হেলিয়ে দিলে।

'থাক্, এ-সব কথা আর না বললে। শিগ্‌গির কোনো বই ছুঁয়েছি বলে' মনে তো পড়ে না—অবিশ্যি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ছাড়া—'

'প্রকৃতিতে ক্ষতিপূরণের একটা ব্যবস্থা আছেই,' মণিলাল চাপা গলায় হেসে উঠলো। তার মনে পড়লো প্রশান্ত তাকে কত বই পড়াবার চেষ্টা করেছে, কত উত্তেজিত বক্তৃতা দিয়েছে; একবার, প্রশান্তের কত সাধাসাধির পরে, কী কষ্টে, কী দীর্ঘ সময় নিয়ে সে আনা কারেনিনা পড়েছিলো। সে-কথা মনে করে' সে আবার হেসে উঠলো, একটু অসংলগ্ন-ভাবে। তারপর বললে, 'এতদিন খুব ঘুরলে যা হোক্।'

'বেড়াবার সখ ছিলো খুবই, কিন্তু অদৃষ্ট যে তা ঠিক এইরকম করে' মেটাবে তা অবিশ্যি ভাবতে পারিনি।'

'অদৃষ্টের ব্যবহারই ঐ রকম। আমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ করবে, কিন্তু মনে হবে যেন ঠাট্টা।'

'যা দেখছি, তুমিই ভালো আছো। একেবারে সেট্‌ল্‌ড্ ডাউন, মায়'—প্রশান্ত ঘরের কোণের দিকে তাকালো, 'গ্রামোফোন পর্য্যন্ত।'

'হ্যাঁ, একেবারে সেট্‌ল্‌ড্ ডাউন। আর যা-ই বলো,' মণিলাল গলার স্বর একটু নিচু করলে, 'এটা কিছু খারাপ নয়।'

'আমি তো ভালোই বলছি।'

'নিজের কিছু ভাবতে হয় না, কিছু করতে হয় না। লক্ষ্মী ছেলের মত আপিসে আসা-যাওয়া করলেই খালাস। তা ছাড়া, তার বাইরে যা-কিছু তার জন্তে আছে লাবণ্য।

কেমন করে ঘর সাজানো হবে, সপ্তাহের কোন্‌-কোন্‌ বারে মাংস খাওয়া হবে, অমুকের বিয়েতে সাড়ি দেওয়া হবে কত দামের, কবে কোন্‌ ছবি দেখতে যাবো—সব লাবণ্য ঠিক করে' দেয়। কী আরাম ভাবতে পারো না।'

'বিবাহ একেবারে অবিমিশ্র অমঙ্গল নয় এ তো আমি বরাবর বলে এসেছি,' প্রশান্ত মুচকি হেসে বললে।

কিন্তু মণিলাল গম্ভীর মুখে বলতে লাগলো, 'না, সত্যি—বিয়ে করে' যে এত সুখী হওয়া যায় তা আমার ধারণা ছিলো না। লাবণ্য লেখাপড়া একটু বেশি করে' ফেলেছে—তা হোক, ওর সঙ্গে আমার চমৎকার খাপ খায়।'

হয়-তো—প্রশান্তর অন্তত তা-ই মনে হ'লো—মণিলাল পরের মুহূর্ত্তেই বলতো, 'একটু বোসো, তাকে ডেকে আনছি,' কিন্তু তার দরকার হ'লো না, লতা-আঁকা পর্দা সরিয়ে স্বয়ং লাবণ্য ঘরে এসে ঢুকলো। লম্বা, মানানসইরকম চওড়া, উগ্র সাদা গায়ের রঙ। পুরু কাচের চশমার ভিতর দিয়ে চোখ ভালো করে' দেখা যায় না। মোটের উপর ভারি জমকালো চেহারা। ভালো কাপড়-চোপড় পরে' রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে রাস্তার লোক হাঁ করে' তাকিয়ে থাকবে। বাড়ির আটপৌরে পোষাকেও মনে রীতিমত সম্ভ্রমের-উদ্রেক করে। প্রশান্ত ধাঁ করে' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

কিন্তু লাবণ্য তাকে লক্ষ্যই করলে না। একবার, মাত্র

একবার চশমার পুরু আড়াল থেকে সে তার দিকে তাকালো, তারপর, ঘরে যেন আর কোনো লোক নেই এমনি সুরে স্বামীকে বললে :

'কী, স্নানের সময় হ'লো না তোমার ?'

মণিলাল লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো।—'তাই তো! ক'টা বাজলো ?'

'ন'টা বাজলো বলে'। তোমার দাড়ি কামাবার জল ঠাণ্ডা হয়ে' গেছে।'

'যাচ্ছি, যাচ্ছি। আর দু'মিনিট। লাবণ্য, এর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই—আমার অতি পুরোনো এবং প্রিয় বন্ধু প্রশান্তকুমার দত্ত।'

'ও, আপনি!' লাবণ্যর অত্যন্ত-লাল ঠোঁটে একটুখানি হাসি ঝিলিক মেরে গেলো। 'আপনি এলাহাবাদে থাকতেন না ?'

'আগ্রায়।'

'ও, হ্যাঁ—তাই তো, আগ্রায়। কবে এসেছেন এখানে ?'

দুটো চারটে ভদ্র আলাপ হ'লো।

তারপর মণিলাল ম্লানমুখে বললে, 'আমার তো আপিসের প্রায় সময় হ'য়ে এলো—'

'বাঃ, তার জন্যে কী হয়েছে। আমাকে এমনিও এক্ষুনি উঠতে হ'তো—অনেক জায়গায় দেখা করতে হবে।'

'কিন্তু,' লাবণ্যর সমস্ত মুখে আতিথেয়তার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়লো, 'ও-বেলা আসবেন কথা দিয়ে যান্।'

'আসবো—নিশ্চয়ই।'

'রাত্তিরে খাবেন এখানে।'

প্রশান্ত মাথা নেড়ে সায় দিলে।

'তাই বলে' ঠিক খাবার সময়েই আসবেন না—বিকেলের দিকেই চলে' আসবেন—যদি কোনো অসুবিধে না হয়।'

'না, না, অসুবিধে আর কী।' বন্ধুপত্নীর সৌজন্যে প্রশান্ত প্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলো, বেশি কিছু বলতে পারলে না।

* *
*

ঠিক সন্ধেবেলায় প্রশান্ত এলো। ইলেকট্রিক আলোয় বসবার সেই ঘরটি আরো ঝক্‌ঝকে, আরো বেশি নিখুঁতরকম পরিপাটি দেখাচ্ছে। ইজি-চেয়ারে আধো শুয়ে মণিলাল সিগ্রেট খাচ্ছে। পাশে একটা চেয়ারে বসে' লাবণ্য কুশি-কাঁটা দিয়ে কী যে বুনছে আরো কয়েকদিন না গেলে ঠিক বোঝা যাবে না। পরনে তার বেগুনি রঙের সাড়ি,

আঙুলের নড়া-চড়ার সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ আংটির হীরে ঝল্‌সে উঠছে। কপালে ছোট সিঁদুরের ফোঁটা—মনে হয়, অমন কপাল স্পর্শ করতে পেরে সিঁদুরই ধন্য হয়েছে। প্রশান্ত, অনেকদিন স্ত্রী-সংশ্রব-বর্জ্জিত, পরের জিনিসের কেনা-বেচা নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত, এই পরিপূর্ণ দীপ্তিতে লাবণ্যকে দেখে হঠাৎ একটু থমকে দাঁড়ালো।

'আসুন,' লাবণ্য সেলাইটা পাশের ছোট টেবিলে রেখে দিলে। 'এত দেরি করলেন যে ?

'দেরি আর কোথায় ?'

প্রশান্তকে বসতে হ'লো একটা কোচে, মণিলালের উল্টো দিকে, মাঝখানে অনেকখানি মেঝে। এইরকম ভদ্র দূরত্ব বজায় রেখে গল্প করার অভ্যেস তাদের কখনো ছিলো না। মনে-মনে সে খুব আরাম বোধ করলে না, কিন্তু নিজেকে তার একটু যেন সম্মানিতও মনে হ'লো। লাবণ্য, এই মহিলা—সে তার এতই উপরে, পরিবেষে, স্বভাবে, সংস্কারে এতই দূরে সরানো যে সে যে তাকে এমন সুচারু সৌজন্যে আপ্যায়ন করেছে এটাকে সে তার একটা সৌভাগ্য মনে না করে' পারলে না।

মণিলাল জিজ্ঞেস করলে. 'সারাদিন কী করলে ?'

'ওঃ, কত লোকের সঙ্গে যে দেখা করতে হ'লো ! আর যা গরম।'

লাবণ্য উঠে পাখার বেগ আর এক ডিগ্রি চড়িয়ে দিলে। তারপর বললে, 'আপনার তো আরো বেশি কষ্ট হবার কথা—পশ্চিমে তো এ-রকম হিউমিডিটি নেই।'

প্রশান্ত নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে, 'বেঁচে থাক্ এই স্যাঁৎসেঁতে বাঙলাদেশ।'

'আপনার ভালো লাগে এই ক্লাইমেট?'

'এতদিন পর কী ভালোই যে লাগছে বলবার নয়।'

'তা ছাড়া,' মণিলাল বললে, 'শুধু ক্লাইমেট নিয়ে কি মানুষ বাঁচে?'

'কেন, পশ্চিমেই তো তবু দুটো-চারটে ভদ্র-বাঙালি দেখা যায়।' ছেলেবেলায় লাবণ্য একবার দানাপুর ক্যান্টনমেণ্টে তার আই-এম-এস্ কাকার সঙ্গে কিছুকাল কাটিয়েছিলো, সেখানে প্রতিবেশী চাকুরেদের বাড়িতে মেলামেশা করে প্রবাসী বাঙালি সম্বন্ধে সে যে-ধারণা করেছিলো আজ পর্যন্ত বদলাবার কারণ ঘটেনি—কেন না বড় হ'য়ে সে আর পশ্চিমে যায়নি।

'কী যেন,' প্রশান্ত তর্ক এড়িয়ে গেলো, 'আমাকে কাজ নিয়েই থাকতে হয়—কারো সঙ্গে মেশবার সময় বড় একটা হয় না।'

লাবণ্য হঠাৎ জিজ্ঞেস্ করলে, 'তাজমহল সম্বন্ধে আপনার কী মত?'

অপ্রস্তুত মুহূর্তে প্রশান্ত বলে' ফেললো কেন, বেশ ভালোই তো।'

'না—আপনার সত্যি কী মনে হয়?' পুরু চশমার আড়াল থেকে স্থিরদৃষ্টিতে লাবণ্য প্রশান্তর দিকে তাকালো। 'লোকে যতটা বলে সত্যি কি তা-ই?'

প্রশান্ত ভিতরে-ভিতরে ঘেমে উঠলো। মণিলাল তাড়াতাড়ি বলে' উঠলো, 'এত লোকের যখন এত ভালো লেগেছে তখন কিছু আছে নিশ্চয়ই।'

'না—আজকাল কিন্তু অনেকে তাজমহলের স্থাপত্যের অনেক খুঁত ধরছেন। আমি এইটে জানতে চাই যে তাজের খ্যাতির কারণটা কী—sentimental না fornal।'

প্রশান্ত রুমাল বা'র করে' ঘাড় মুছলো।

'আমি বলতে চাই যে তাজ দেখে লোকের এত যে উচ্ছ্বাস তা যদি হয় প্রধানত শা-জাহানের প্রেমের কথা স্মরণ করে' সেটা অবিশ্যি তার খাঁটি আর্টিস্টিক মূল্যের কোনো যাচাই নয়।'

'আমাদের দেশে তাজমহলের খ্যাতি অবিশ্যি রবীন্দ্রনাথের কবিতার জন্য,' প্রশান্ত হঠাৎ বলবার একটা কথা খুঁজে পেলো। কথাটা শুনে লাবণ্য এমনভাবে হাসলো যেন কথাটা তারই, এতক্ষণ এটাই সে মনে-মনে ভাবছিলো, এবং তারই জোরে এটা সে স্থির করে' নিয়েছে—

প্রশান্তর মুখে ওটা উদ্ধৃতি-বাক্য মাত্র। 'ঠিক,' সে বলে' উঠলো, 'ঠিক কথা। আমাদের সৌন্দর্য্য উপভোগেও যে কতখানি কন্‌ভেন্‌শন মিশে থাকে ভাবলে অবাক হ'তে হয়। কিন্তু জ্যোছনা-রাতে তাজ শুনেছি সত্যি আশ্চর্য্য।'

'আমিও তা-ই শুনেছি।'

'শুনেছি মানে? আপনি দেখেননি।'

'গিয়েই একদিন দেখেছিলাম—দিনের আলোয়। তারপর যাবো-যাবো করে' আর হ'য়ে ওঠেনি—যা কাজের চাপ।,' প্রশান্তর কণ্ঠস্বর শেষেরদিকে অত্যন্ত ক্ষীণ হ'য়ে এলো। 'আগ্রার বাইরেই ওর বেশির ভাগ সময় কাটে,' মণিলাল বললে।

'কিন্তু একদিনও কি সময় হ'লো না?' লাবণ্যর কথার সুর এমন—যেন প্রশান্তর এই অবহেলা তার ব্যক্তিগত কোনো ক্ষতি করেছে। সে ঈষৎ কাঁধ-ঝাঁকুনি দিলে—যেন জানাতে চায় এ-প্রসঙ্গ আর চলতে দিতে সে ইচ্ছুক নয়। তবু প্রশান্ত বললে, অর্দ্ধস্ফুটস্বরে, খানিকটা পাপ-ক্ষালন করবার আশায়, 'যেখানে থাকি, তাজ সেখান থেকে অনেক দূরে। কিন্তু এবার গিয়ে নিশ্চয়ই'—কথাটা শেষ করতে না-পেরে সে একটা সিগ্রেট ধরালো।

কিন্তু লাবণ্য কথাটাকে লক্ষ্যই করলে না। একটু ফাঁক পেয়ে মণিলাল বললে, 'কতকাল আর ভূতের মত ঘুরে বেড়াবে—এইবার কলকাতায় এসে বোসো।'

'আপনাকে খুব ট্যুর করতে হয় বুঝি?' লাবণ্য জিজ্ঞেস করলে।

'রেলগাড়িতেই জীবনটা কাটলো,' প্রশান্ত হেসে বললে।

'কোথায়-কোথায় গিয়েছেন?'

'কোথায় যাইনি! এই তো সেদিন গোয়ালিয়র থেকে এলাম।'

'গোয়ালিয়র! গানের জন্য বিখ্যাত!'

প্রশান্ত মৃদু একটু কেশে নড়ে'-চড়ে' বসলো।

'আমাদের হিন্দু-সঙ্গীত নেটিভ-ষ্টেটগুলোই তো বাঁচিয়ে রেখেছে,' বলে' লাবণ্য উৎসুক-দৃষ্টিতে প্রশান্তর মুখে তাকালো।

একটু লাল হ'য়ে উঠলো প্রশান্তর মুখ। ভাঙা-ভাঙা ভাবে বললে, 'আমার অবিশ্যি সময় হয় না—কত কাজ থাকে হাতে—,

'গানে আপনার ইণ্টারেস্ট্ নেই?'

'ইণ্টারেস্ট খুবই আছে, কিন্তু...'প্রশান্ত ঘাড় উঁচু করে' ইলেক্‌ট্রিক্ আলোর বাল্‌বের দিকে একরাশ ধোঁয়া নির্গত করলে।

'এত সব জায়গা ঘুরলেন, কিছুই দেখলেন না, শুনলেন না। It's a pity.' তারপর, মুহূর্তকাল চুপ করে' থেকে, যেন প্রশান্তর এতদিন রস-উপবাস দূর করবার শুভেচ্ছায় প্রণোদিত হ'য়ে লাবণ্য বললে:

'দু'একটা রেকর্ড শুনবেন?'

প্রশান্ত তার বন্ধুর দিকে তাকালো, কিন্তু তার সঙ্গে চোখোচোখি হ'লো না। মণিলাল এমনভাবে গা ঝেড়ে দিয়ে বসেছে যে তাকে দেখেই মনে হয় যে রোজ এই সময়ে ইজি-চেয়ারে শুয়ে গোটাকয়েক রেকর্ড শোনে।

'নিশ্চয়', প্রশান্ত বললে।

'বিলিতি গান-বাজনা আপনার কেমন লাগে?' চেয়ার থেকে উঠে গ্রামোফোনের দিকে যেতে-যেতে লাবণ্য জিজ্ঞেস করলে।

'ভালো লাগে খুব।'

'শালিয়াপিনের ভল্‌গা-বোট সং নিশ্চয়ই শুনেছেন?'

'তা হোক্‌, তা হোক্‌', প্রশান্ত তাড়াতাড়ি বল্‌লে। 'আবার শুনতে দোষ কী?'

'আবার! লক্ষবার শুনতেও দোষ নেই।'

রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে লাবণ্য ফিরে এসে বসলো। যতক্ষণ রেকর্ড চললো, দু'বন্ধু পরস্পরের দিকে তাকাতে সাহস পেলো না, কেননা পুরু চশমার আড়াল থেকে লাবণ্যর চোখ থেকে-থেকে দু'জনেরই মুখের উপর এসে পড়ছে। মণিলাল একদৃষ্টিতে সীলিঙের দিকে তাকিয়ে রইলো, প্রশান্ত রইলো চোখ বুজে।

রেকর্ড থামলো। লাবণ্য উঠে দাঁড়ালো দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে।

'কেমন ?'

প্রশান্ত শালিয়াপিনের ভল্‌গা-বোট সং-এর প্রচুর সুখ্যাতি করলে।

'এইবার এটা শুনুন।' একটু পরে অর্কেষ্ট্রার পরিপূর্ণ স্বর হঠাৎ ঝড়ের মত ভেঙে পড়লো। লাবণ্য স্বামীর দিকে তাকিয়ে একাবার ভুরু তুললো।

মণিলাল চাপা গলায় বললে: 'Hungarian Rhapody.'

'রাইট!' মাঝে-মাঝে স্বামীকে সে এমনি করে' পরীক্ষা করে। এত শোনবার পরও মাঝে-মাঝে তার ভুল হয়। 'কান'ই নেই আসলে। কিন্তু চর্চ্চা করতে-করতেই কান হয়। এতদিনে গান-বাজনা সম্বন্ধে তার দস্তুরমত একটু বোধ হয়েছে। লাবণ্যর ভাবতেও ভালো লাগে। যা-ই বলো না, শুধু টাকা-পয়সা, ঘর-সংসার নিয়ে কি জীবন কাটে।'

'এটা আগে শুনেছিলেন?' রেকর্ডটা তুলে রেখে লাবণ্য জিজ্ঞেস করলে।

প্রশান্ত মাথা নাড়লে।

'আশ্চর্য—না?'

'আশ্চর্য্য!'

'অবিশ্যি প্রথমবার শুনে খুব ভালো হয়-তো লাগে না,

কিন্তু বার-বার শুনতে-শুনতে মনের মধ্যে একটা atmosphere তৈরি হয়—it sort of grows on you—'

প্রশান্ত তাড়াতাড়ি বললে, 'পরে শুনলে আরো বেশি ভালো লাগবে সন্দেহ কী?'

'আর শুনবেন?'

'এটাই?'

'না—অন্য-কোনো রেকর্ড। বলুন না, আপনার কোনো ফেভ্‌রিট আছে নাকি?'

'না, না, আপনার যেটা ইচ্ছে দিন!'

ইয়োরোপীয় সঙ্গীত শোনা হ'লো আরো দুটো। 'লাভ্‌লি লাভ্‌লি', খুব আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে লাবণ্য বলতে লাগলো, 'এক্স-কুইজিট্! আমাদের দেশে ইয়োরোপীয় সঙ্গীতের আদর আরো বেশি হওয়া উচিত।'

'আস্তে-আস্তে হচ্ছে', প্রশান্ত বললে।

'হচ্ছে, না? আজকাল অনেক বাড়িতেই দেখি অন্যান্য রেকর্ডের সঙ্গে বিলিতি রেকর্ড থাকে দু'একখানা করে'। কিন্তু বাজে! আজকালকার সব পপুলার ফিল্মের গাইয়ে। Taste-এর বড় অভাব।'

'চিরকালই', প্রশান্ত বললে।

'আর দিশি গানেরই বা কী অবস্থা। গা ঘিন্‌ঘিন্ করে সব রেকর্ড শুনলে। গ্রামোফোন নেই, এমন বাড়ি আজকাল

খুঁজে পাওয়াই মুস্কিল : এদিকে খোঁজ নিয়ে দেখুন জোহারা বাইয়ের নামই হয়-তো শোনেনি।'

প্রশান্ত দাঁত বার করে' হাসলো। সেই হাসি দিয়ে সে বোঝাতে চাইলো যে ঐ নামের সঙ্গে সে নিজে খুবই ভালো করে' পরিচিত।

'জোহারা বাইয়ের রেকর্ড আজকাল rare হ'য়ে এসেছে। অনেক কষ্টে সেদিন ওঁর ফেমাস্ আশাবরীখানা সংগ্রহ করেছি। শুনুন। Simply Marvellous.'

যেন কোনো পূজার আয়োজন করছে, অত্যন্ত আস্তে, সন্তর্পণে লাবণ্য কাগজের মোড়ক থেকে রেকর্ডটি খুললো। তারপর, যন্ত্রে দম দিতে-দিতে বললে, 'যদি কিছু মনে না করেন, আলোটা নিবিয়ে দেবো। এ-গান অন্ধকারে শোনবার।'

একটু পরে অপরূপ এক স্ত্রী-কণ্ঠ যন্ত্রের গহ্বর থেকে বেজে উঠলো ; সঙ্গে-সঙ্গে লাবণ্য হাত বাড়িয়ে আলোটা নিবিয়ে দিলে।

গান থেমে গেলো, তার পরেও সবাই চুপচাপ। একটু অপেক্ষা করে' মণিলাল বললে, 'এখন আলোটা জ্বালা যায়।'

লাবণ্য আলো জ্বালিয়ে দিয়ে বললে : 'এটা শুনলে আমার এমন অবস্থা হয় যে খানিকক্ষণ হাত-পা নাড়তে পারিনে।'

প্রশান্ত বললে, 'চামিং। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ আপনাকেই। জানেন, এ-রেকর্ডটা কাউকে শোনাতে আমার দস্তুরমত ভয় করে—যদি ভালো না লাগে!'

'এ-গান ভালো না-লাগাও কি সম্ভব?'

হঠাৎ মণিলাল আধ-শোয়া অবস্থা থেকে পিঠ খাড়া করে' বসলো।—'চলো, প্রশান্ত, একটু বেড়িয়ে আসি।'

লাবণ্য বললে: 'এখন কোথায় যাবে? রান্না হ'য়ে যাবে একটু পরেই—খাওয়ার পর চলো সবাই একসঙ্গে বেরুনো যাবে। যদি কোথাও কোনো ভালো ফিল্‌ম্ থাকে—'

মণিলাল বললে: 'আজ আমার কী হয়েছে, একেবারেই খিদে পাচ্ছে না—'

'তোমাকে বলি, রোজ দু'চামচে করে' ফ্রুট-সল্ট্ খাবে—'

'না, না, সে-জন্যে নয়, এমনি। একটুখানি হেঁটে এলেই বোধ হয় খিদে হবে,' বলতে-বলতে মণিলাল উঠে দাঁড়ালো। 'চলো হে।'

'বেশি দেরি করবে না তো?'

'দেরি! এই এক্ষুণি এলাম বলে'। রান্নার কতদূর?'

'দেরি নেই মোটেও। আমি তো ভাবছিলুম ঠাকুরকে

বলি—একটু বোসোই না। প্রশান্তবাবু সারাদিন ঘুরে বেড়িয়েছেন—উনি হয়-তো ক্লান্ত।'

'ক্লান্ত আর এমন কী,' প্রশান্ত লজ্জিতভাবে বললে। 'একটু হেঁটে আসতে আপত্তি নেই।'

দু'বন্ধু ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় পাশাপাশি দাঁড়ালো।

'দেখো, দেরি না-হয় যেন,' স্বামীর মুখের দিকে একটুখানি তাকিয়ে থেকে লাবণ্য আবার বললে।



রাস্তায়, কলকাতার রাস্তায়, কলকাতার অপরূপ গ্রীষ্মসন্ধ্যায়, দু'জনে খানিকক্ষণ চুপচাপ হাঁটলো। মুহূর্তে সবই বদলে গেছে। অতীতের কুয়াশা থেকে উঠে-আসা, বর্তমানের এই ভঙ্গুর মুহূর্তে, দু'জন। তাদের উপর দিয়ে বয়ে' যাচ্ছে কলকাতার হাওয়া, স্মৃতির হাওয়া, পারস্পরিক উষ্ণ-সান্নিধ্যের উষ্ণ হাওয়া।

কথা আরম্ভ করলে মণিলাল : 'লাবণ্য মাঝে-মাঝে একটু বাড়াবাড়ি হয়-তো করে' ফেলে, কিন্তু সত্যি ও গানবাজনা ভালোবাসে।'

প্রশান্ত তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে: 'বাঃ, এ তুমি কী বলছো! চমৎকার তো রেকর্ড শুনলুম কয়েকটা।'

এ-প্রসঙ্গ ওখানেই শেষ হ'লো। উঠলো অন্য সব কথা, রাশি-রাশি কথা, হাসি-ছিটোনো। দু'জনে বড় রাস্তা ধরে' হাঁটতে লাগলো। হঠাৎ প্রশান্ত বলে' উঠলো, 'চলো বাস্-এ করে' কোথাও যাই।'

'কোথায় যাবে? দেরি না হ'য়ে যায় আবার।'

'দেরি হবে কেন? চৌরঙ্গি পর্য্যন্ত গিয়েই ফিরে আসবো। রাত্রের চৌরঙ্গি দেখতে ইচ্ছে করছে।'

বাস্-এ করে' এস্‌প্লানেডের মোড়ে এসে তারা নামলো।

'ওহে, তোমার কিছু টাকা রয়ে' গেছে আমার কাছে, মণিলাল বললে।'

'টাকা?'

'সেই যে আমার বিয়ের সময় পাঠিয়েছিলে।'

'কিছু কিনে দাওনি ওকে?'

'কিনে তো এ-পর্য্যন্ত কত জিনিসই দিলুম।'

'তা দেবেই তো।'

ময়দানের দিকের ফুটপাথের গাছের সারির তলা দিয়ে দু'জনে নিরুদ্দেশভাবে বেড়াতে লাগলো। প্রশান্ত জিজ্ঞেস করলে, 'সে-টাকাটা কি তুমি খরচ করোনি?

'যদি জানতে চাও তোমার নাম করে' কিছু কিনে

দিয়েছি কিনা, তা দিয়েছি। কিন্তু তোমার টাকাটা খরচ হয়নি।'

'বাঃ, আমাকে কিছু দিতেও দেবে না?'

'এ-সব সামাজিক কুপ্রথার প্রশ্রয় দিতে চাইনে।'

'বেশ, তাহ'লে অন্যভাবে খরচ করতে দাও। কাল চলো হোটেলে আমার সঙ্গে। একেবারে শ্যাম্পেন-ডিনার, তার কম কিছু নয়।'

দক্ষিণে খানিকদূর গিয়ে তারা আবার ফিরলো।

'ওঃ, ও-সমস্ত ভুলেই গেছি একেবারে।'

'কেন, এখন তো দিব্যি মোটা মাইনে পাচ্ছো—'

'সে জন্যে নয়। লাবণ্য—বুঝলে না—মানে, ও ঠিক তোমার-আমার মত—মানে, বুঝলে না—'

'ঠিক বুঝেছি। তাহ'লে ডিনারটা আর হ'লো না।'

'কেন, তুমি আর আমি যেতে পারি।'

'লাবণ্যকে বাদ দেওয়া কি—ভালো দেখাবে?'

মণিলাল একটু ভাবলে।

'ঠিক হয়েছে।—কাল ওকে শাঁখারিটোলায় রেখে আসবো, ওর বাপের বাড়িতে।'

'কী বলে' রেখে আসবে?'

'কেন, স্ত্রীলোক তো মাঝে-মাঝে বাপের বাড়ি গিয়েই থাকে।'

প্রশান্ত একটু চুপ করে' রইলো।

'যদি তোমাদের কোনো অস্থবিধে হয় ?'

'না, না,' মণিলাল বলে' উঠলো, 'অস্থবিধে আর কী!'

'লাবণ্যকে কোনোরকমেই একটু শ্যাম্পেন খেতে রাজি করানো যাবে না ?'

মণিলাল গম্ভীরমুখে বললে, 'সে-কথা বলে' আর লাভ কী ? সকলের তো আর সব গুণ থাকে না।'

'আচ্ছা তাহ'লে, তুমি আর আমিই, ঠিক হ'লো।' তারপর হঠাৎ প্রশান্ত বললে, 'চলো না এক গ্লাস বিয়ার খেয়ে আসি।'

'এখন ?'

'হঠাৎ কী রকম তেষ্টা পাচ্ছে—চলো।'

'না, এখন থাক্। দেরি হ'য়ে যাবে।'

'কতকক্ষণ আর! এক চুমুকে এক গ্লাস বিয়ার খেয়েই চলে' আসবো। এসো।' প্রশান্ত বন্ধুকে বাহুর নিচে ধরে' টানলে। মণিলাল দুর্ব্বল একটু আপত্তি করলে, তারপর দু'জনে চৌরঙ্গি পার হ'তে লাগলো।

একটা হোটেলে, যেখানে সেই আগেকার দিনে অনেক অনেক সন্ধ্যা তারা একসঙ্গে যাপন করেছে, দু'জনে কোণের একটা টেবিলে দু' গ্লাস বিয়ার নিয়ে বসলো। তারপর আরম্ভ হ'লো কথা। কত কথা, তার অন্ত নেই।

হঠাৎ এক সময় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মণিলাল লাফিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলো।—'ন'টা বেজে গেছে! চলো শিগ্‌গির।'

'বোসো না আর-একটু।'

'না, চলো। লাবণ্য আবার খাওয়ার সময় সম্বন্ধে ভয়ানক নিয়ম মেনে চলে।'

'একদিন একটু দেরি হ'লে কী হয়?'

'না, না, এখন চলো। কাল তো আসবোই আবার।'

অগত্যা প্রশান্তকে উঠতে হ'লো। ফেরবার পথে মণিলাল ভালো করে' কথা বললে না। ঘন-ঘন হাতের ঘড়ির দিকে তাকাতে লাগলো।

'গিয়েই খাওয়াটা সেরে নেবো, বুঝলে?' বাস্‌ থেকে নেমে বাড়ির দিকে হাঁটতে-হাঁটতে মণিলাল বললে। 'তুমি চট্‌ করে আবার চলে' যেয়ো না—লাবণ্য খাওয়ার পর বেশি জেগে থাকতে পারে না—তারপর, অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

দু' বন্ধু সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলো। সিঁড়ির মাথাতেই লাবণ্য দাঁড়িয়ে।—'এত দেরি হ'লো যে?'

'এই হ'য়ে গেলো একটু দেরি। চলো, বসিগে।' লাবণ্যর পাশ দিয়ে মণিলাল এগিয়ে যাচ্ছিলো, লাবণ্য হঠাৎ বাতাসটা কয়েকবার শুঁক্‌লো।

'কী-রকম একটা গন্ধ পাচ্ছি।'

'গন্ধ? গন্ধ কিসের? চলো, বেশ খিদে পেয়েছে এতক্ষণে।'

কিন্তু লাবণ্য তার স্বামীর কাছে এসে দাঁড়ালো।—'কিছু খেয়েছো নাকি?'

মণিলাল হাসবার চেষ্টা করলে।—'কী আবার খাবো? খেতে চাইছি তা তো দেখতেই পাচ্ছো। প্রশান্ত, তুমি হাত-মুখ ধোবে নাকি?'

'গ্যাখো, মিথ্যে কথা বলছো কেন?' পুরু চশমার আড়াল থেকে লাবণ্য সোজা তার স্বামীর চোখের দিকে তাকালো।

মণিলাল চোখ নামিয়ে নিলে।—'কী বলছো তুমি?'

'কী বলছি তা তুমি ভালো করে'ই জানো। কেন মিছিমিছি লুকোবার চেষ্টা করছো?'

'লাবণ্য—'

'চুপ করো, তোমার কোনো কথা শুনতে চাইনে।' লাবণ্য হঠাৎ গলা বাড়িয়ে মণিলালের মুখের খুব কাছে মুখ এনে জোরে-জোরে কয়েকবার নিঃশ্বাস টানলে। তারপর সমস্ত বাঁধ ভেঙে বলে' উঠলো:

'Awful! Smelling like rabbits. লজ্জা করে না তোমার—এই এত রাত্রে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরতে! আর

আমি এতক্ষণ ভাত নিয়ে বসে' আছি। Oh, these men! Shameless—'

'লাবণ্য, শোনো—it was nothing, just a glass of beer—'

কিন্তু মণিলালের ক্ষীণ স্বর কোথায় তলিয়ে গেলো:

'Smelling like pigs! আর আমি সেই কখন্ থেকে বসে' আছি। Lout! Scum! প্রশান্তবাবু নিতান্ত ভদ্রলোক, তাঁকেও জোর করে' টেনে নিয়ে গেলো। মানুষের একটু চক্ষুলজ্জাও হয়।'

প্রশান্ত মাথা নিচু করে' পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে, মণিলাল কী বলবার চেষ্টা করছে ভালো বোঝা যাচ্ছে না, আর লাবণ্য অনর্গল কথা বলে' যাচ্ছে ত' থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে' মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে:

'Lout! Lout! Scum!

স্রোতস্বিনী

[ভবানীপুরের এক বাড়ির একতলার রাস্তার উপরে ঘর ; রাস্তার দিকে দরজা নীল পরদায় ঢাকা—হাওয়ায় সেটা মাঝে-মাঝে নড়ে' উঠছে। ঘরের মাঝামাঝি একটা মাঝারি টেবিল—তার উপর বই, কাগজ-পত্র, কাগজ-চাপা, ছাইদান ইত্যাদি একটু বিশৃঙ্খলভাবে ছড়ানো। টেবিলের এক কোণে একটা নীল ঢাকনা-ওয়ালা টেব্‌ল-ল্যাম্প্, এখন নেবানো। সীলিঙ্‌ থেকে ঝুলছে উজ্জ্বল ইলেক্‌ট্রিক বাতি।

ঘরের মধ্যে বসে' আছে দু'জন। দরজার দিকে পিঠ দিয়ে টেবিলের কাছে এক যুবক, বয়েস সাতাশের মত। গায়ে তার পাৎলা একটা সুতোর পাঞ্জাবি, গলার ও তার নিচের বোতামটা খোলা। এক কনুই সে রেখেছে টেবিলের উপর, আঙুলগুলো চালিয়ে দিয়েছে চুলের মধ্যে ; তার চোখ আনত, কী যেন ভাবছে। তার হাতের ঠিক কাছে লেখবার প্যাড একটা, আর ফাউণ্টেন পেন। আর টেবিলের পাশাপাশি

একটা ডেক্‌-চেয়ারে অর্দ্ধ শায়িত একটি মেয়ে—বছর কুড়ি বয়েস। লাল রঙের একটা কুশান তার কোলে, কুশান-ঢাকনার ফ্রিল্‌গুলো নিয়ে খেলা করছে তার আঙুল।

এরা দু'জন যে স্বামী-স্ত্রী তা দেখেই বোঝা যায়—পরস্পরের উপস্থিতিতে এরা এত সহজ; এদের মধ্যে, আপাতত, কথা বলবার প্রয়োজন এত কম; পরস্পরের মধ্যে এদের এমন সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃতি। এরা এখন পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছেও না। তবু যেন একে অন্যের মধ্যে নিচ্ছে তার পরিপূর্ণ সুখ।

স্বামীর নাম হেমন্ত, আর স্ত্রীর মীরা। গ্রীষ্মের রাত্রির এগারোটা বেজে গেছে। যবনিকা ওঠবার পর একটু সময় চুপচাপ। তারপর:]

মীরা (ছোট্ট হাই তুলে)। উঃ, ঘুম পাচ্ছে।

হেমন্ত (স্ত্রীর দিকে চোখ তুলে)। যাও, শুয়ে থাকো গে।

মীরা। তুমি?

হেমন্ত। আমি আসছি।

মীরা (ক্ষীণ হেসে)। আসছো? তিনটে? না চারটে?

হেমন্ত (ক্ষীণ হেসে)। পাঁচটাও হ'তে পারে—ঈশ্বর যদি দয়া করেন।

মীরা (পিঠ খাড়া করে')। কী যে তুমি করো এক-এক সময়।

হেমন্ত। কী করি?

মীরা। রাতের পর রাত এ-রকম করে' জাগবার কোনো মানে হয় না।

হেমন্ত। কিন্তু বই তো শেষ করতেই হবে। আর-তিনদিনের মধ্যে কাপি দিতেই হবে আমাকে। পাব্লিশর টাকা নিয়ে প্রস্তুত।

মীরা। কদ্দূর হয়েছে?

হেমন্ত। হ'য়ে এসেছে। আজ রাত্রে যদি এই চ্যাপ্টারটা শেষ করতে পারি, তারপর আর-একটা। তা হ'লেই শেষ। শেষ—ভাবতেও আমার শরীরটা কেমন শিরশির করে' ওঠে।

মীরা। উঃ, বাঁচবে।

হেমন্ত। বাঁচবো কি একটু! টাকাগুলো হাতে আসুক না একবার—তারপর কয়েকদিন শুধু ঘুম আর গল্প, গল্প আর ঘুম।—কিন্তু এখন ও-সব কথা ভাবতে নেই। লেখা থেকে তাহ'লে মন চলে' যাবে।

মীরা (স্বামীর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে)। কী চেহারাই করেছো এ-ক'দিনে।

হেমন্ত (নিজের গালে একবার হাত বুলিয়ে)। কেন, বেশ ভালোই তো আছি। বেশ ভালো লাগছে আমার।

মীরা (একটু চুপ করে' থেকে)। আজ রাত্রে তো কফিও খেলে না।

হেমন্ত। না, এমনিতেই বেশ গরম আজ। তা ছাড়া

একটা বই যখন শেষ হ'য়ে আসতে থাকে অদ্ভুত অবস্থা হয় মনের আর শরীরের : মনে হয় কখনো আমার আর ঘুম পাবে না, কখনো আমার আর ক্লান্ত লাগবে না। মনকে খাটাবার একটা সীমা বোধ হয় আছে, যা পার হ'লে বাইরের কোনো জিনিসের সাহায্য পর্য্যন্ত দরকার হয় না, এমনি চলতে থাকে।

মীরা। Nerves.

হেমন্ত। হ্যাঁ, nervesই তো। একটা নেশার মত যেন। কী-রকম যে হয়, সমস্ত শরীর যেন জ্বলতে থাকে, টন্‌টন্‌ করতে থাকে আঙুলের ডগাগুলো। তুমি বলছো ঘুমের কথা—তুমি কি মনে করো এখন আমি শুতে গেলেও ঘুমুতে পারবো?

মীরা (শান্ত, বড়-বড় চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে)। কাল তুমি কখন্ শুতে এলে টেরও পেলুম না।

হেমন্ত। তোমাকে আর বিরক্ত করতে চাইনি।

মীরা। একটু জাগালে না কেন?

হেমন্ত (একটু চুপ করে' থেকে)। মীরা, তোমার যখন মন ভালো থাকে না, রাত্রির অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে কি তুমি কোনো প্রার্থনা করো না? কী প্রার্থনা করো তুমি?

মীরা (চুপ করে' রইলো)।

হেমন্ত। বলো না।

মীরা (আস্তে-আস্তে)। আমার প্রার্থনা কী, তা তুমি বুঝতে পারো না ?

হেমন্ত (আস্তে হেসে উঠে)। আঃ, স্ত্রী ! স্ত্রী !

মীরা। স্ত্রী-ই তো। মেয়ে। মেয়ে হ'তে লজ্জা করবো কেন ?

হেমন্ত (একটু পরে)। আমিও প্রার্থনা করি এক-এক রাত্রে—তা অন্য রকম। কেবল একটি প্রার্থনা আমার আছে : শক্তি দাও দেবতা, আরো শক্তি দাও আমাকে। যদি দিলেই, এমন কৃপণের মত দিলে কেন ?

মীরা। দেবতা তোমাকে যথেষ্ট দিয়েছেন। তুমি ভাগ্যবান।

হেমন্ত। না, যথেষ্ট নয়। তুমি যদি জানতে কী সব আশ্চর্য্য জিনিস আমি ভাবি ! আমার লেখায় তার কতটুকু ধরা পড়ে ? কল্পনা অপরিসীম, তার প্রকাশ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

মীরা। তা যদি না হ'তো, তবে কি এত আনন্দ থাকতো কল্পনায় ?

হেমন্ত। কিন্তু অন্যায়, এটা ভয়ানক অন্যায়। এমন আশ্চর্য্য সব ভাবনা—তা প্রকাশ করবার ক্ষমতা যদি আমার না থাকে, তবে তারা আসেই বা কেন ? দেবতা যদি কমই দিলেন, তাহ'লে কল্পনাশক্তি আরো একটু কমিয়ে দিলে দোষ ছিলো না। এ কি ঘোরতর অন্যায় মনে হয়

না তোমার—এমন প্রবল কল্পনার সঙ্গে এতটুকু মাত্র প্রকাশের ক্ষমতা জুড়ে দেয়া? যত সুন্দর করে' একটা জিনিস ভাবি লেখা কিছুতেই তত সুন্দর হয় না কেন?

মীরা। পৃথিবীর যাঁরা শ্রেষ্ঠ লেখক তাঁদের বেলাতেও বোধ হয় তা-ই হয়েছে।

হেমন্ত। যদি তা-ই হ'য়েও থাকে, সেটা তো আমার কোনো সান্ত্বনা নয়। আরো শক্তি কি আমার কখনো হবে? যত সময়ে যত অপরূপ কল্পনা আমার মনে এসেছে, সব কি প্রকাশ করতে পারবো? তার এতটুকু অংশ কি প্রকাশ করতে পারবো?

মীরা। প্রার্থনা করো—আর অপেক্ষা করো।

হেমন্ত (হঠাৎ নিম্নস্বরে হেসে উঠে)। যা-ই হোক্, তোমার এখন আর অপেক্ষা করে' কাজ নেই। তোমার চোখ লাল হ'য়ে উঠেছে। (হাতের কাছে প্যাডটার পাতা উল্‌টিয়ে পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠাটা পড়তে লাগলো) আ, বেশ। বেশ হয়েছে এই লেখা। (চোখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে) ছাখো, প্রতিবার যখন একটা শেষ করি, মনে-মনে বলি, এইবার আমি একটা masterpiece লিখলুম। আর প্রতিবারই, অবিশ্যি, মাসখানেক না-যেতেই আমার সে-মোহ কেটে যায়।

মীরা। লিখে যে সুখ পাও, সেটাই কি কম?

হেমন্ত। (প্যাডের পৃষ্ঠাগুলো ওল্টাতে-ওল্টাতে) সুখ! সুখ! আনন্দ! যন্ত্রণা! কী আনন্দ, কী যন্ত্রণা, তা আমি কখনো কাউকে বলতে পারবো না। (একটু পরে অন্য রকম স্বরে) শোনো, দিন তিনেক চলবে তো?

মীরা। টাকা? ওঃ, খুব। (একটু হেসে) এমন কি, চারদিনও চলতে পারে, জোর করে বলা যায় না।

হেমন্ত। তুমি তোমার বাক্সের আনাচে-কানাচে যে সব টাকা লুকিয়ে রাখো, সেগুলো এবার বা'র করো আর কি।

মীরা (উঠে দাঁড়িয়ে)। থাক্, সে-জন্য তোমায় ভাবতে হবে না। তুমি লেখো বসে'।

হেমন্ত। আর কি—ক'দিন পরেই তো টাকায় গড়াগড়ি দেবো।

মীরা। হ্যাঁ—এ-পাশ ফিরলে টাকা, ও-পাশ ফিরলে টাকা: ঘুম হয় না রাত্তিরে।

হেমন্ত। ক্যান্‌কিঙে একবার যেতেই হবে—কী বলো? না কি বাড়িতেই দেবে একটা ভোজ?

মীরা। আমি তো ভেবেছিলাম গ্র্যাণ্ড হোটেলে একটা পার্টি দেবো।

হেমন্ত। ঠাট্টা? দাঁড়াও না—দস্তুরমত একদিন ট্যাক্সিতে বেড়াবো—যতক্ষণ তুমি চাও। (একটু থেমে) অবিশ্যি দশ টাকার বেশি না হয়।

[মীরা নিম্নস্বরে একটু হেসে উঠলো। তারপর হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে পিষে মারলো একটা হাই। সামনের কোণে ভিতরে যাবার দরজা, তার দিকে এগিয়ে এলো কয়েক পা। তারপর হঠাৎ থেমে, রাস্তার দিকের দরজার দিকে তাকিয়ে]

মীরা। দরজাটা বন্ধ করে' দিয়ে যাই।

হেমন্ত। না, না, ওটা খোলাই থাক্।

মীরা। সারাক্ষণ খোলা থাকবে?

হেমন্ত। থাক্ না, কী আর হবে। বেশ হাওয়া আসছে। বড় আলোটা নিবিয়ে দাও।

[হেমন্ত চাবি টিপে টেব্‌ল্‌-ল্যাম্পটা জ্বালালে। সঙ্গে-সঙ্গে মীরা সুইচ টিপলো। সমস্ত ঘর ছায়ায় ভরে' গেলো, শুধু হেমন্তর সামনে টেবিলের উপর, তার লেখবার কাগজের, তার একখানা হাতের উপর নরম আলো। আলোর শেড্‌টা টেনে দেয়া; তার পাৎলা, মাংসবিরল মুখেও অস্পষ্ট ছায়া। সে চেয়ারে ভালো হ'য়ে বসে' কলমটা হাতে তুলে নিলে।]

মীরা (ছায়া থেকে)। রাত্তিরে যদি চা কি কফি খেতে হয়, আমাকে ডেকো।

হেমন্ত। (অন্যমনস্কভাবে)। আচ্ছা।

মীরা। (তবু একটু দাঁড়িয়ে)। আজ দুটোর বেশি জেগো না, কেমন?

হেমন্ত। (সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত)। হুঁ।

মীরা (আর-একবার)। দুটো—কি আড়াইটে বড় জোর। আর আমাকে একটু ডেকো।

হেমন্ত (কাগজ থেকে চোখ তুলে, ছায়ার ভিতর দিয়ে মীরার দিকে তাকিয়ে)। লক্ষ্মী, তুমি এখন শুতে যাও।

[বলে'ই সে আবার চোখ নিচু করলো। মীরা নিঃশব্দে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো কোণের দরজা দিয়ে। হেমন্ত চেয়ারের পিঠে একটু হেলান দিলে, ধরালে একটা সিগ্রেট, ভাবলে একটু, তারপর বাঁ দিকের ছাইদানে সিগ্রেটটা রেখে কলম তুলে নিয়ে প্যাডের উপর মাথা নিচু করলো। শেডের ফাঁক দিয়ে তার ক্ষীণ ম্লান মুখে একটু আলো এসে পড়লো। নেমে এলো যবনিকা।

আবার উঠলো মুহূর্ত্ত পরেই। চার ঘণ্টা কেটে গেছে। ছাইদান ভরে' উঠেছে সিগ্রেটের টুকরোয়। হেমন্ত সেইখানেই বসে' আছে, মাথা ভরে' চুল এলোমেলো, মুখ বিবর্ণ, চোখ একটু আরক্ত। এই মুহূর্ত্তে সে হাত থেকে কলমটা নামিয়ে চেয়ারে হেলান দিলে। হাতের সঙ্গে হাত ঘষে' ডান হাতের আঙুলগুলো একবার মটকালো। মুহূর্ত্তের জন্য চোখ খুলে তাকালো প্যাডটার দিকে, একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে' তারপর আবার কলম তুলে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলো।

এমন সময় পিছনের দরজাটার নীল পরদা সরিয়ে

একটা লোক নিঃশব্দে ঢুকলো ঘরের মধ্যে। বেঁটে-মত, রোগা, মুখ ভরে' খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। আধ-ময়লা কাপড় আর নোঙরা হলদে রঙের পাঞ্জাবি পরনে। পায়ে জুতো নেই। অথচ মাথার চুল চক্‌চকে, পরিপাটি, মাঝখানে টেড়ি কেটে দু'দিকের চুল বিশ্রী ঢঙে শিঙের মত কপালের উপর নামিয়ে দেয়া।

লোকটা আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে পিছন থেকে খপ্‌ করে' হেমন্তর কলম-সুদ্ধ ডান হাতটা চেপে ধরলো। কলমটা কাগজের উপর দীর্ঘ একটা আঁকিবুঁকি রেখা এঁকে গেলো—ভীষণভাবে চমকে উঠে হেমন্ত মুখ ফেরালো। তার চোখ বিস্ফারিত, মুখের হাঁ খুলে গেছে, সে চীৎকার করে' উঠতো আর-একটু হ'লেই।]

লোকটা (খুব কঠোর স্বর আনবার চেষ্টা করে')। চাবি দাও।

হেমন্ত (বাঁ হাতের আঙুল ঠোঁটের উপর চেপে ধরে')। স্‌স্‌স্‌! চুপ!

লোকটা। চাবি দাও, বলছি।

হেমন্ত (তীব্র চাপা গলায়)। বলছি চেঁচিয়ো না। একজন ঘুমুচ্ছে।

লোকটা। তোমারও তো এ-সময়ে ঘুমোনো উচিত ছিলো। কী করছো তুমি বসে-বসে?

হেমন্ত। অদৃষ্টের বিধান পালন করছি।

লোকটা (ব্যঙ্গের সুরে)। ফুঃ! তোমার অদৃষ্ট! তুমি—বুর্জোয়া, পেতি বুর্জোয়া!

হেমন্ত। ঐ তো ছাখো, অল্প আলাপে মানুষের সম্বন্ধে মানুষের কী রকম ভুল ধারণা হয়। হাতটা ছাড়ো, বুঝিয়ে বলছি।

লোকটা। হুঁ-হুঁ—চালাকি! আগে বাঁ হাত দিয়ে ড্রয়ার টেনে চাবি বার করো; তারপর।

হেমন্ত। বাঁ দিকের ড্রয়ারে শুধু কতগুলো কাগজ আছে—তা তোমার কোনোই কাজে লাগবে না। চাবি যার কাছে, সে ঘুমুচ্ছে। তাকে এখন আমি জাগাতে পারবো না কিছুতেই।

লোকটা। খোলো না, চাঁদ, ড্রয়ারটা।

হেমন্ত (মুখ ফিরিয়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে)। ছাখো, এত রাত্তিরে দু'জন ভদ্রলোক মারামারি করলে ভালো দেখাবে না। হাত ছাড়ো, তারপর তোমার কী বলবার আছে বলো।

লোকটা (হেমন্তর কাঁধের উপর দিয়ে প্যাডের সদ্য লিখিত কাগজটার দিকে তাকিয়ে)। কী লিখছিলে ও-সব?

হেমন্ত। অদৃষ্টের লিপি, বলতে পারো।

লোকটা (গলা বাড়িয়ে কয়েকটা লাইনের উপর চোখ

বুলিয়ে)। ছোঃ! গল্প! প্রেমের গল্প। মোটা-মোটা ডিপ্‌টি-গিন্নিরা দুপুরবেলায় শুয়ে-শুয়ে পড়বে।

হেমন্ত। সেই তো দুঃখ, বন্ধু, সেই তো দুঃখ!

লোকটা। আর তুমি! বুর্জোয়া সেন্টিমেন্টের খোরাক জুটিয়ে নিজে মোটা হচ্ছো। ফোঃ!

হেমন্ত। হায়, তুমি একটু-আধটু লেখাপড়া শিখে বড় ভুল করেছো।

লোকটা (হিংস্রভাবে)। আর তুমি তো চমৎকার উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক! তোমার বাপ কোথায়?

হেমন্ত। স্বর্গে।

লোকটা। তিনি কত রেখে গিয়েছিলেন?

হেমন্ত। শুনে কী করবে? তার একটা পয়সাও এখন নেই।

লোকটা। তা না-ই বা থাকলো। তুমি তো আছো। তুমি, উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক! ভাগ্য যদি একচুল ভুল করতো তাহ'লে আমি আজ হয়-তো একটা প্রোফেসর হতুম।

হেমন্ত। ভালো করেছো না-হ'য়ে।—কিন্তু হাতটা ছাড়ো না। এ-রকম করলে কি গল্প জমে?

লোকটা। কত দেবে বলো আগে।

হেমন্ত। নাঃ! (চট্ করে' উঠে দাঁড়িয়ে সে তার বাঁ

হাত লোকটার গলার উপর রাখলো। সঙ্গে-সঙ্গে লোকটা তার হাত ছেড়ে দিয়ে ছেলেমানুষের মত চেঁচিয়ে উঠলো)।

লোকটা। উঃ গেলুম! গেলুম!

হেমন্ত (তাড়াতাড়ি লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে)। এই, চেঁচিয়ো না! বলিনি তোমাকে একজন ঘুমুচ্ছে!

লোকটা (বাঁ দিকের বুকে হাত রেখে)। বাবাঃ যা ভয় পেয়েছিলুম।

হেমন্ত (হাসি সামলাতে না পেরে)। বাঃ, চমৎকার চোর তুমি!

লোকটা (কলকাতার ছোটলোকের ককনি সুরে)। আর বলবেন না মোসাই, [উচ্চারণ, মোশাই] হার্টটা একেবারে ঝাঁজরা—একটুকুতেই কামারের হাঁপর হ'য়ে ওঠে। বাপের বুড়ো বয়েসের ছেলে। জন্ম থেকেই টিকটিকি। ছেলেবেলায় হাঁপানি ছেল। তার ওপর নেশাটা আশটা বরাবরই চলেছে কিনা। (গলায় একবার হাত বুলিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো) উঃ! যদি দয়া করে' এক গেলাশ জল দেন, স্যর।

হেমন্ত (লোকটার এই নতুন ধরণের কথাবার্ত্তা সে অবাক হ'য়ে শুনছিলো)। ব্যস্ত হোয়ো না। ঠাণ্ডা হও একটু। সরে' গিয়ে ঘরের বড় আলোটা জ্বালিয়ে দিলে, নিবিয়ে দিলে টেব্‌ল্‌-ল্যাম্প্‌। বোসো না। (ঘরের অন্য দিকে সরে' গিয়ে) এখানে এসে বোসো।

[অন্য দিকে, সাদা কাপড়ে ঢাকা গোল একটা টেবিলকে কয়েকটা চেয়ার ঘিরে রয়েছে। লোকটা নিতান্ত ভালো মানুষের মত আস্তে-আস্তে একটায় গিয়ে বসলো—অত্যন্ত সঙ্কুচিতভাবে, ভয়ে-ভয়ে যেন।]

হেমন্ত। (জানলার তাকে কুঁজো থেকে জল গড়াতে-গড়াতে)। ভালো হ'য়ে বোসো।

[যেন এটা একটা আদেশ যা পালন না করলেই নয়, লোকটা চমকে উঠে তার শরীরের যতটা সম্ভব চেয়ারের মধ্যে টেনে নিলে। দু'হাত ছড়িয়ে দিলে হাতলের উপর, এলিয়ে দিলে মাথা।]

হেমন্ত (জলের গেলাস নিয়ে এসে)। এই নাও।

লোকটা (তাড়াতাড়ি গেলাসটা নিয়ে ঢক্‌ঢক্ ক'রে খানিকটা খেয়ে)। আঃ। (গেলাসটা টেবিলের উপর রেখে, হঠাৎ মুখ বিকৃত ক'রে) উঃ!

হেমন্ত। কী হ'লো আবার?

লোকটা। পেটটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো হঠাৎ। খালি পেটে জলটা ঠিক সয় না।

[একটু সময়, হেমন্ত লোকটার দিকে চুপ ক'রে তাকিয়ে রইলো। এতক্ষণে সে তাকে ভালো ক'রে দেখলো। উজ্জ্বল আলোয় ফুটে উঠেছে তার মুখের কঠিন শীর্ণতা, তার চোখের ক্ষুধিত রুগ্নভাব। অপরিমিত তাম্বুল চর্ব্বণে

ঠোঁট তার কালো। তবু সে ভয়াবহ নয়, ভয়ানক নয়—সে শুধু ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, অত্যন্ত তুচ্ছ। শিথিল, অবসন্নভাবে সেই চেয়ারে বসে' তাকে মনে হ'লো ঠিক যেন দুর্ভাগ্যের প্রতিমূর্ত্তি।]

হেমন্ত। (আস্তে-আস্তে)। তোমার পেট, তাহ'লে, সম্প্রতি খালি যাচ্ছে?

লোকটা (একটু লজ্জিতভাবে)। ওঃ, এ-রকম আমার মাঝে-মাঝেই হয়। কিছু এসে যায় না। কপালে থাকলে শিগ্‌গিরই হয়-তো বড় গোছের একটা খাওয়া জুটে যাবে, চাই কি মাইফেল সুদ্ধ।

হেমন্ত। এখন তো কোনো তৈরি খাবার নেই বাড়িতে। স্ত্রী আছেন ঘুমিয়ে—

লোকটা (করুণস্বরে)। থাক্, থাক্, কোনো কষ্ট করবেন না যেন আমার জন্য। সত্যি আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। হঠাৎ কী রকম মোচড় দিয়ে উঠেছিলো এই জায়গাটা (পেটের বাঁ দিকে হাত রেখে)—ঠাণ্ডা জল। তা যা-ই বলুন, আমাদের জীবনটাও মন্দ নয় নেহাৎ। কোনো বাঁধ নেই কোনোখানে—ঘুরে-ঘুরে বেড়ানো, এখান থেকে ওখানে, এ-আড্ডায় থেকে ও-আড্ডায়, খাওয়ার গন্ধ শুঁকে-শুঁকে। আজ কপালে কী আছে জানিনে। কাল রাত্রে কোথায় ঘুমুবো জানিনে। স্বাধীন জীবন। আজকাল তো

আমরা সবাই স্বাধীনতা চাই। রোজ দু' বেলা একই সময়ে একই জায়গা থেকে আমার খাবার আসছে, এ তো আমার ভাবতেই বিশ্রী লাগে।

হেমন্ত (এতক্ষণ সে যেন অন্য কী ভাবছিলো)। দাঁড়াও, দেখি। (লেখবার টেবিলের ধারে এসে সে ড্রয়ার খুলে ঘাঁটাঘাঁটি করলে খানিকক্ষণ)। আ, তোমার কপাল ভালো। (লোকটার কাছে এসে সে একটা টাকা রাখলো টেবিলের উপর।) এটা কী করে' ওখানে ছিলো বুঝতে পারছিনে। বোধ হয় অনেক আগে মীরা একদিন ফেলে' রেখেছিলো— তারপর গিয়েছিলো ভুলে'। যাক্‌, তোমার কপাল ভালো। ভালো করে' খেয়ো কাল। (লোকটার পাশে একটা চেয়ারে বসলো)।

[মুহূর্তের জন্য লোকটার চোখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করে' উঠলো, তার হাত এলো এগিয়ে। কিন্তু পরের মুহূর্তেই সে হাত সরিয়ে নিলে]।

হেমন্ত (একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে)। একটা টাকা। কিছুই নয়। কিন্তু এর বেশি আমি আজ পারিনে।

লোকটা (একটু উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে হেমন্তর দিকে তাকিয়ে)। থানায় একটা নালিশ করবেন তো ?

হেমন্ত। নালিশ ? কেন ?

লোকটা (ঢোঁক গিলে)। এই যে আমি—আমি—

জানেন তো, সুবিধে করতে পারলে আমি চুরি করতে ছাড়তুম না।

হেমন্ত। পাগল হয়েছো! সে-জন্য আমি নালিশ করতে যাই আর কি। যা ঝকমারি পুলিশকোর্টের।

লোকটা। কেন, করুন না নালিশ। চোরকে হাতের মুঠোয় পেয়ে কে ছেড়ে দেয়?

হেমন্ত। কখনো জেলে যাওনি তো?

লোকটা। আজ্ঞে এখনো সে-সৌভাগ্য হয়নি। ভাবছিলুম অনেক দিন তো কাটলো ছুটোছুটি করে' ছট্‌ফট্‌ করে' এখন একটু রেস্‌ট্‌ নিলে মন্দ হয় না। দিব্যি শান্তিতে কয়েক মাসের চেঞ্জ—বুঝলেন না? করুন না নালিশ—আর-একজনের জন্য একটু কষ্টই না-হয় করলেন। সংসারে একজন আর-একজনকে সাহায্য না করলে চলবে কী করে'?

হেমন্ত। কিন্তু সত্যি যা ঘটেছে তার জন্য ওরা তোমায় জেলেই দিতে চাইবে না। আমি তো আর মিথ্যে বলতে পারবো না তোমার নামে।

লোকটা (দীর্ঘশ্বাস ফেলে')। তাহ'লে আর কী। (হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে সে তার জামার পকেটে রাখলো)। আপনার স্ত্রী এমনি ভুল করে' আরো দু' একটা ফেলে রাখেন নি?

হেমন্ত। তাহ'লে তোমায় আর বলতে হ'তো না।

তোমাকে যে এত দিতে পারবো তা-ও আমি আশা করিনি। তোমার ব্যবসা খাটাবার পক্ষে আমার বাড়ির নির্ব্বাচন তোমার ভয়ানক ভুল হয়েছে।

লোকটা (ক্লান্তস্বরে)। তা-ই দেখছি। অন্য-কোনো বাড়ি হ'লে জেলে ঠিক যেতে পারতুম।

হেমন্ত (লোকটার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে)। ঘুম পাচ্ছে নাকি তোমার? কিন্তু দেখো, এখানেই ঘুমিয়ে পোড়ো না কিন্তু। মীরা কী ভাববে সকালবেলায়! একটা সিগ্রেট খাবে?

লোকটা (আবার করুনি সুরে)। সিগ্রেট? দিন। শালা বিড়ি টেনে-টেনে দাঁতে পোকা পড়ে' গেলো।

[হেমন্ত উঠে গিয়ে তার লেখবার টেবিল থেকে সিগ্রেট দেশলাই আর ছাইদান নিয়ে এলো। লোকটাকে সিগ্রেট দিয়ে নিজে নিলে একটা]।

লোকটা (সিগ্রেটটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে)। আ, গোল্ড ফ্লেক, গোল্ড ফ্লেক। বড় ভালো জিনিস (s), মোসাই।

[হেমন্ত দেশলাই জ্বালিয়ে লোকটার সামনে ধরলো। সিগ্রেট ধরিয়েই সে কেশে উঠলো খক্‌খক্ করে'।]

হেমন্ত। এই—আস্তে, আস্তে। (নিজের সিগ্রেট ধরালো।)

লোকটা (কাশি সাম্‌লে নিয়ে গভীর নিঃশ্বাসে বুকের মধ্যে ধোঁয়া টেনে নিয়ে)। আঃ, বড় ভালো জিনিস, মোসাই,

বড় ভালো জিনিস। একটু ভরা পেটের উপর হ'লে আরো জমতো।

হেমন্ত। (একটু পরে) এ-ব্যবসায় তোমার নতুন হাত মনে হচ্ছে?

লোকটা। এ-সব ছোট নজর আমার আগে ছেল না, স্যর। (করুনি সুরে)

হেমন্ত। তুমি তো ইচ্ছে করলেই ভালো করে' কথা বলতে পারো। তা-ই বলো না কেন?

লোকটা (তার কালো ঠোঁট একটু হাসিতে বাঁকিয়ে)। যা-ই বলুন না, ছোটলোকদের কথার টানটা বেশ। বেশ জোর আছে। আর ভদ্দরলোক হ'য়ে লাভ কী বলুন—ভদ্দরলোকের বুড়ো আঙুল চুষে তো আর বাঁচা যায় না।

হেমন্ত। ভদ্রলোকের উপর তোমার বেজায় রাগ দেখছি।

লোকটা (নোঙরা দাঁত বা'র করে' হেসে) ভদ্দরলোক! জেণ্টলম্যান! ভদ্দরলোক কি চুরি করে না? লোক ঠকায় না? মিথ্যে কথা বলে না? নিজের একটু সুবিধের জন্য অন্যের সর্ব্বনাশ করে না? সবই করে। তবে? তাদের কোঁচার ঝুলে সব ঢেকে যায়। বুঝেছেন মোসাই, কোঁচার ঝুল! ভদ্দরলোক কি আর সাধে বলে!

হেমন্ত। সে যা-ই হোক, তোমার যা অবস্থা দেখছি, এ-ব্যবসা তোমার চলবে বলে' মনে হয় না। জেলে না-হয়

কোনো রকম করে' একবার গেলেই। তা ক'দিন আর তোমাকে রাখবে সেখানে।

লোকটা (পিঠ খাড়া করে' একবার আড়মোড়া ভেঙে)। নাঃ, এ-সব আমার পোষাবে না। শিগ্‌গিরই আবার নীলমণিবাবুর কাছে গিয়ে ধন্না দিতে হবে, দেখছি।

হেমন্ত। কে নীলমণিবাবু ?

লোকটা। সে কী ! নীলমণিবাবুর নাম শুনেননি ? আমাদের নীলমণি দে—যিনি ঐ বিভীষণ বলে' কাগজটা চালান।

হেমন্ত (তার অজ্ঞতা গোপন করবার চেষ্টা করে')। ও।

লোকটা। ঘোরেল লোক মশাই—ঐ তো এক পয়সার কাগজ, এদিকে দেখুন গে তাঁর তেতলা বাড়ি। মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন টাটকা এক ডিপ্‌টির সঙ্গে। মেয়ের নাম সোনা—দেখতে পোড়াকাঠ। আমি হ'লে তো ওটাকে আঙুল দিয়ে এম্‌নি করে'ও (নস্যির টিপ নেবার ধরণে বাঁ হাতের দু' আঙুল একত্র করে') ছুঁতুম না। কিন্তু সোনা তো নামেও—কাজেও। (ঘোড়ার মত বিশ্রী শব্দ করে' হেসে উঠলো।)

হেমন্ত। ঐ কাগজটা খুব চলে বুঝি ?

লোকটা (তার ভাসা-ভাসা জোলো চোখ ঘুরিয়ে)। বে—শ ! আপনি আছেন কোথায় ? কাগজ বিক্রির জন্য বসে' থাকতে হ'লেই নীলমণি দের হয়েছিলো আর কি। বড়-

বড় সব লোক আছে না কলকাতার—দিগ্‌গজ, প্রকাণ্ড হোমরা-চোমরা—মোটরে-মোটরে যাঁরা ঘুরে বেড়ান, বক্তৃতা দেন লম্বা-লম্বা, একটু-কিছু হ'লেই হাঁশফাঁশ করতে-করতে ছোটেন কোথায় দিল্লি আর কোথায় বোম্বাই আর কোথায় লণ্ডন সেই সব মস্ত ঘরের মস্ত নামের মস্ত সব লোক আছে না—তাদের নিয়েই তো দেশের সব ক'টা কাগজের কারবার। কেবল আমাদের নীলমণিবাবু তাদের কথা কিছু লেখেন না—নেহাৎ দরকার না হ'লে। বড়লোকদের মধ্যে এমন বোকাও কেউ-কেউ আছেন যাঁরা প্রথমটায় বয়ে' গেলো বলে' উড়িয়ে দিতে চান। লাভের মধ্যে পরে চচ্চড় করে' দ্বিগুণ টাকা বেরিয়ে আসে।

হেমন্ত (এতক্ষণে ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে—গম্ভীর মুখে)। ও। তুমি তাহ'লে সেই নীলমণি দের একজন চর?

লোকটা (উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে হেমন্তর দিকে তাকিয়ে)। রাগ করলেন? কী করবো বলুন, পেট তো ভরাতে হবে! যত ভালো-ভালো কথাই বলুন না, পেটের কাৎরানি তো থামবে না তা শুনে। আর মন্দ মজাও নয়—হি-হি (দুর্বলভাবে একটু হেসে) দিগ্‌গজ, দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষদের এই সব কাণ্ড! হি-হি—বেশ মজাই—কী বলেন? আমার কাজ ছিলো শুধু ঘুরে-ঘুরে বেড়ানো, চোখ খুলে রাখা। কে কোথায় গেলো, কে কার সঙ্গে বেরুলো, কে কাকে তার মোটরে করে'

অন্য কার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেলো। কাজটা সুখেরই, বলতে পারেন। আ, তোমরা, তোমরা সব মস্ত লোক, মানী লোক, তোমরা দেশের মাথা, তোমরাও! তাহ'লে আমাদের আর দোষ কী—আমরা, রাস্তার কুকুর, নর্দ্দমার পোকা! আমরা, তোমাদের মোটরের চাকার নিচে পড়ে' মরবার যুগ্যিও আমরা নই!

হেমন্ত। তাহ'লে নীলমণিবাবুর সঙ্গে বেশ ভালোই ছিলে বলো!

লোকটা। তা মন্দ নয় এক রকম। কিন্তু কী আর পেতুম ছাই। ঐ নীলমণি—ব্যাটার জন্য আমি কম করেছি! সেই যে বেলপুকুরের ছোট রাণীর কাণ্ডটা নিয়ে শালা অমন প্রকাণ্ড দাঁওটা মারলে—ড্রাইভারকে কত কষ্টে পটিয়ে চিঠি চুরি করে এনেছিলো কে? এই আমিই তো। ঐ একটা চিঠির জোরেই তো শালা নীলমণির তিন তলা বাড়ি উঠলো। আর আমি—আমাকে তো দেখছেনই। শালা অমন ছোটলোক, একদিন মুখ ফুটে পাঁচটা টাকা চাইলুম—একটু বিলিতি খাবার সখ গেছল—তা দিলে না। বললে—বকশিষ কী রে আবার? জানিস্, তুই যে-সব কাজ করছিস্, আমি ইচ্ছে করলেই তোকে এক্ষুনি পাঁচ বচ্ছর কয়েদ ঠুকে দিতে পারি? শালা ছোটলোক! চামার!

হেমন্ত (এই-সব অভিনব রহস্য উন্মোচনে স্তম্ভিত।) তারপর?

লোকটা। তারপর আর কী। চলে' এলুম ছেড়ে। বাঁচলুম হাঁফ ছেড়ে। বড় নোঙরা কাজ, মশাই; ও-সব ভদ্দরলোকেরই পোষায়।

হেমন্ত। তা তুমিও ভদ্রলোক হ'য়ে গেলে না কেন? তেতলা বাড়ি তো উঠতো।

লোকটা। অদেষ্ট, স্যর, অদেষ্ট! ভদ্দরলোক হ'তে পারলে কী আর ভাবনা ছিলো? ভদ্দরলোকের সবই ভালো। তারা যখন চুরি করে তাকে বলে বুদ্ধির প্যাঁচ। তারা যখন লুঠ-তরাজ করে, তাকে বলে জমিদারি। তারা যখন লোভের তাড়ায় নিজেদের মধ্যে কামড়া-কামড়ি করে' মারে—আর মরে, তাকে বলে জীবন-সংগ্রাম। চোর! চোর! চোর কে নয়? একহাজার লোকের ভাগেরটা চুরি না-করলে একজন মস্ত বড়মানুষ কী করে' হয়?

হেমন্ত। ঠিক আমার মনের কথাটা বলেছো। দ্যাখো আমি তোমাকে বলছি, তোমার বুদ্ধি খাটিয়ে খাওয়া উচিত।

লোকটা (বিশ্রীভাবে ঠোঁট উল্‌টিয়ে)। বুদ্ধি! বুদ্ধি তো আর চোখে দেখা যায় না, স্যর। আর জামা-কাপড় যদি নোঙরা হয়, তাহ'লে একেবারেই দেখা যায় না।

হেমন্ত। সে-কথা ঠিক।

লোকটা (হঠাৎ, একটু গর্ব্বের সুরে)। আর ইস্কুলে আমি ভালো ছাত্র ছিলুম, অঙ্কে মাথা ছিলো। ম্যাট্রিকুলেশন

দিতে পারলে একটা স্কলার্শিপ পেয়ে যেতুম হয়-তো। (এই কথাগুলো সে বললে অত্যন্ত ভদ্রভাবে, বিশুদ্ধ উচ্চারণে।)

হেমন্ত। কদ্দূর পড়েছিলে?

লোকটা (উগ্রতম ককনি সুরে)। থার্ড্ডো কেলাশ বাপ ছেল কম্পাউণ্ডার, বারো মাস কাশিতে ধুঁক্‌ছে, এই আছে কি নেই। বড় ভাইবোনেরা কেউ মরেছে—কেউ এদিক-ওদিক ভেসে গেছে যার-যার কপাল নিয়ে। বুড়ো বয়েসের ছেলে আমি—বুড়ো বয়েসের পাপের ফল—আদরের ছড়াছড়ি একেবারে। বাপ একটা ওষুধ কিনতে পারে না—কাশতে-কাশতে চোখ ওঠে কপালে—তবু আমাকে পাঠানো চাই ইস্কুলে, বুড়োর অনেক আশা ছেল—কী এক মহাপণ্ডিত বুঝি তিনি ধরাধামে এনেছেন! এদিকে আমিও ঘোড়ার মত লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে লাগলুম কেলাশ থেকে কেলাশে থার্ড কেলাশে এসেই থামলো দৌড়—বুড়ো বাপ টেঁশলো বেরিয়ে এলুম ইস্কুল থেকে সটান এক ছাপাখানায়—কম্পোজিটারের কাজ শিখতে। পাঁচ টাকা করে' দিতো—খাটাতো ভূতের মত। এদিকে মা-মাগিরও মরণ নেই। এক ভাই নাকি ডিব্রুগড়ে মনোহারি দোকান দিয়ে বেশ আছে—চোখেও দেখিনি তাকে। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে' বেরিয়ে গেছ্‌ল—তারপর ব্যোম ভোলানাথ! আর খোঁজ নেই। দিদিরা মাসে-মাসে টাকাটা সিকিটা পাঠাতো—তা সোয়ামির

লাথি খেয়ে-খেয়ে তারাও অ্যাদ্দিনে আধ-মরা! অনেক কষ্টে দশ টাকা মাইনে হ'লো—সঙ্গে-সঙ্গে মা স্বর্গে উঠলেন।

হেমন্ত (নিঃস্পন্দ হয়ে সে শুনছে)। যাক্, বাঁচলে।

লোকটা। হ্যাঁ, বাঁচলুম। হঠাৎ দেখা গেলো সমস্ত সংসারে আমি একেবারে একা। বাঃ, বেশ মজা তো। দশ্‌শালা—ছাপাখানার এই ব্যাগার কে আর খাটতে যায়—বেরিয়ে পড়লুম রাস্তায়।

হেমন্ত। তারপর?

লোকটা। তারপর এই তো চলছে। বিশ রকমের কাজে হাত দিয়েছি। কাগজের হকার, বাস-এর কণ্ডক্টর, চায়ের দোকানের বয়, বইয়ের দোকানের কেরানি, থিয়েটারে ইলেকট্রিকের মেকানিক—একবার ছোট একটা পার্টেও নেমেছিলুম, হি-হি।

হেমন্ত। তোমার তো অনেক গুণ দেখছি—কোথাও লেগে থাকতে পারলে না?

লোকটা। কোনোখানেই ভালো লাগে না, স্যর। ভালো লাগে ভেসে বেড়াতেই। রাস্তার গন্ধ শুঁকতে না-পারলে যেন প্রাণ বাঁচে না। কুকুর, রাস্তার কুকুর।

হেমন্ত। শেষ পর্য্যন্ত মহাবিদ্যার চর্চ্চা না করবার পরামর্শ তোমাকে কে দিলে?

লোকটা। ওঃ, ও-কথা বলবেন না, স্যর। আমি কোনো

আখড়ার ভাড়াটে নই। মেছোবাজারের অনেক বড়-বড় আখড়ার সঙ্গে আমার দহরম-মহরম অবিশ্যি। আজকাল সোম-রসের ছিটে-ফোঁটা যা একটু পেটে পড়ে, তা ওদেরই আড্ডায়। ছন্নু মিঞা বড় ভালোবাসে আমাকে, মিঞাসাহেব বড় দিল-দরিয়া লোক, বড় ভালো লোক। সেদিন আমাকে বলছিলো—'ব্যাটা, তোকে এত খাওয়ালুম, আমার জন্যে তুই কী করলি?' আমি বললুম, 'ক্যান্ রে, তোর সঙ্গে এত মজার গল্প করি বসে', সেটা কম?' ছন্নু বললে, 'তুই যদি খালি ভাঁড়ামি না করে' একটা কাজে মন দিতিস! তুই আয় না আমার দলে—বড়-বড় কাজ করবি। তুই লেখা-পড়া জানিস, তোর বুদ্ধি আছে। তোকে যদি পাই তবে ছ্যাঁচড়ামো ছেড়ে দিয়ে একবার চেকালিতে নামি।'

হেমন্ত (বুঝতে না পেরে)। চেকালি?

লোকটা (একটু হেসে)। ছন্নুর ও-রকম নিজের বানানো অনেক কথা আছে। অন্যের নামে লম্বা চেক কাটা আর কি—বুঝলেন না। ছন্নু বলে, 'কত লোকের অত লক্ষ টাকা গহিন গাঙের মাছের মত খামকা ব্যাঙ্কে পড়ে' আছে—একটু হাতের লেখার ছিপ ফেলে যদি একটা বড় গোছের মাছ এনে ডাঙায় ফেলতে পারি, দোষ কী? যার টাকা সে তো টেরও পাবে না—তার কত আছে। অথচ আমরা পেট ভরে' খেয়ে বাঁচবো।'

হেমন্ত। ওদিকে চেষ্টা করেছো নাকি দু' একবার?

লোকটা। অনেক সাধাসাধি করেছিল, আমি গা করলুম না। ভালো লাগে না আর ও-সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে। আর খেটে খেতে ইচ্ছে করে না, স্যর; ইচ্ছে করে কোনোদিকে বেরিয়ে যাই, মাঠের মধ্যে শুয়ে থাকি চিৎ হ'য়ে, শুয়ে-শুয়ে আকাশের তারা গুণি।

হেমন্ত। আমারও ঠিক তা-ই ইচ্ছা করে। কিন্তু তোমার তো জানা উচিত আমাদের জীবনে কত ছোটখাটো ইচ্ছাও চিরকাল অপূর্ণ থেকে যায়।

লোকটা। বসে' বসে' আমি কেন খেতে পারবো না— কয়েকদিন, কয়েকদিন অন্তত। কত মাংসপিণ্ড জমিদার তো সমস্ত জীবন অমনি করে' কাটিয়ে দেয়। আর আমাকেই কি চিরদিন রাস্তার কুকুরের মত খাওয়া শুঁকে-শুঁকে বেড়াতে হবে?

হেমন্ত। (লোকটার শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে' রইলো)।

লোকটা (ক্লান্ত, একটানা স্বরে)। আমিও কি বাঁচতে পারিনে? আর-কিছু নয়; একটু জিরোতে চাই, হাত-পা ছড়িয়ে বসতে চাই একটু। আজ রাত্রে সেই কখন্ থেকে ঘুরছি রাস্তায়-রাস্তায়। কোন্ রাস্তা দিয়ে কোথায় এসে পড়লুম, এখন কিছু মনে করতে পারিনে। নিশুতি রাতে রাস্তাগুলো বেশ লাগে, একেবারে ফাঁকা, দু'দিকে অন্ধকার

বাড়ি। আপনার বাড়ির সামনা দিয়ে যেতে-যেতে চোখে পড়লো আলো। দরজাটাও খোলা। একটু দাঁড়ালুম। হঠাৎ খেয়াল হ'লো যাই না কেন ঢুকে। খুব একচোট মার হয়-তো খাবো—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যদি জেলে যেতে পারি, 'সে-মার সইবে। কোনোরকম করে' যে-কোনোরকম করে' একবার জেলে যদি যেতে পারি! আর ভালো লাগে না পথে-পথে ঘুরে বেড়াতে।

হেমন্ত। তুমি যা চেয়েছিলে তা হ'লো না—আমি দুঃখিত সে-জন্য।

লোকটা। হ্যাঁ, জানি, জানি। আপনারা ভদ্রলোক, আপনাদের মনে কেবল ন্যায়—অন্যায়, ভালো-মন্দ; আপনাদের মনে মানুষের জন্য ভালোবাসা নেই!

হেমন্ত (চুপ)।

লোকটা (ক্ষীণ, নিম্নস্বরে)। আর তবু—আপনার এখানে বসে'-বসে' আমার বেশ লাগছে। আপনাকে—কী বলে?—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এই যে বসেছি, আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। আঃ, বেশ, বেশ। শেষরাত্রের হাওয়াটা কী-রকম ঠাণ্ডা দেখেছেন? ঘুম পাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে। বাঁচতে ভালো লাগে; যে যা-ই বলুক, বাঁচতে বড় ভালো লাগে। (বলতে-বলতে তার চোখ জড়িয়ে এলো; তার মাথাটা একবার ধাঁ করে' নেমে এলো নিচের দিকে)।

হেমন্ত (চমকে উঠে)। এই, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি? ঘুমিয়ো না, ঘুমিয়ে পোড়ো না।

লোকটা (একবার অস্পষ্টভাবে চোখ মেলেই আবার কাঁধের উপর মাথা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজলো)।

হেমন্ত। এই! কী মুস্কিল। (চেয়ার থেকে উঠে লোকটার কাছে দাঁড়িয়ে তার কাঁধ ধরে' ঝাঁকুনি দিয়ে) এই! শুনছো!

লোকটা (আরক্ত চোখ মেলে')। উঁ?

হেমন্ত (উচ্চস্বরে)। ঘুমিয়ো না, ঘুমিয়ো না। তুমি এখানে ঘুমিয়ে পড়লে মীরাকে আমি কী বলবো?

লোকটা (কঠিন চেষ্টায় জেগে উঠে)। উঁ? না, ঘুমুবো না। ঘুমোবো না। হেঁ-হেঁ—বড্ড ঘুম পেয়ে গেছ্‌ল।

হেমন্ত। তুমি এখন যাও। আমি যদি এখনো শুতে না যাই তাহ'লে মীরা হয় তো জেগেই উঠবে।

লোকটা। হ্যাঁ, যেতে হয় এবার।

হেমন্ত। আস্তে-আস্তে বেরিয়ে যাও, বেশি শব্দ কোরো না।

লোকটা (ঘরের চারদিকে একবার তাকিয়ে)। রাত তো প্রায় ফুরিয়ে এলো—দিব্যি মর্নিং ওয়াক্ হবে।

হেমন্ত (উদ্বিগ্ন ভাবে)। হ্যাঁ—গরমের রাত, ভোর হ'তে আর কতক্ষণ। আমাকে একটুখানি শুতে তো হবে। যাও, ওঠো।

লোকটা (একটু চুপ করে' থেকে, করুণ স্বরে)। আর একটুখানি বসতে কি পারিনে?

হেমন্ত (ব্যাকুলভাবে চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে)। এখন কী করে' বসবে? বোঝো না কেন? এক্ষুনি হয়-তো মীরা উঠে আসবে—আর তখন কী কাণ্ডটা হবে ভাবো তো?

লোকটা (তবু ইতস্তত করতে করতে)। উঃ পা-টা এমনিতেই ধরে' আছে—এখন আবার সেই সাত রাজ্যির পথ হাঁটা।

হেমন্ত। এক কাজ করো। বড় রাস্তায় গিয়ে একটু দাঁড়াও, একটু পরেই বাস্ বেরোবে।

লোকটা। বাস্-এ উঠতে তো পারি, কিন্তু কোথায় নামবো তার যে ঠিক নেই। কোথায় নামবো? কোথায় নামবো? নাঃ—হাঁটাই ভালো—হাঁটতে-হাঁটতে যেখানে গিয়ে ঠেকি।

হেমন্ত। আর দেরি কোরো না। যাও!

লোকটা। যেতে তো হবেই। (অত্যন্ত অনিচ্ছায় চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো।)

মীরার কণ্ঠস্বর। এ কী! তুমি এখনো—

[বলতে-বলতে ভিতরের দরজা দিয়ে মীরা এসে ঢুকলো। কিন্তু ঘরের মধ্যে পা দিয়েই সে চুপ করে' গেলো। সঙ্কুচিত, আড়ষ্ট, লোকটা তিন-বাঁকা হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

আর হেমন্ত রইলো সোজা মেঝের দিকে তাকিয়ে। দু' এক মিনিট নিরেট নীরবতা।]

হেমন্ত (হঠাৎ মীরার দিকে তাকিয়ে—অত্যন্ত দ্রুত, অসমান স্বরে)। এই যে, মীরা। আমি শুতে যাচ্ছিলুম অনেক আগেই, ইনি হঠাৎ এসে পড়লেন—এই ভদ্রলোক—এই—(অত্যন্ত বেখাপ্পাভাবে নেমে গেলো)।

মীরা (বিস্ময়ে বড়-বড় চোখে একজন থেকে আর-একজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগলো)।

লোকটা (শরীরের একটা আড়ষ্ট ভঙ্গি করে'—ভাঙা-ভাঙা গলায়)। আচ্ছা, আমি তাহ'লে এবার—(মীরার দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে এক পা এগোলো।)

মীরা (হেমন্তর দিকে তাকিয়ে)। কী? কী হয়েছে? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে।

হেমন্ত (তাড়াতাড়ি)। ইনি যাচ্ছিলেন রাস্তা দিয়ে,—ক্লান্ত লাগছিলো—একটু বসে' গেলেন—

মীরা (লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে)। এত রাত্তিরে!

[একটু চুপচাপ। হেমন্ত তার পাঞ্জাবির একটা বোতাম নিয়ে প্রাণ-পণে নাড়াচাড়া করতে-করতে ভাবতে লাগলো, কী বলা যায়। লোকটা ঘাড় কাৎ করে' শিথিলভাবে দাঁড়িয়ে—অনেকটা রুগ্ন কোনো পশুর মত দেখতে।]

হেমন্ত (হঠাৎ)। মীরা, এঁর সঙ্গে আলাপ করো। ইনি একজন উঁচুদরের দার্শনিক। (লোকটার প্রতি) বসুন না আপনি।

মীরা (অবাক হ'য়ে চুপ করে' রইলো)।

লোকটা (এইবার সোজা মীরার চোখের দিকে তাকিয়ে)। আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন—আমি অসময়ে এসে আপনার স্বামীর কাজের ও ঘুমের ব্যাঘাত করলুম।

হেমন্ত (সোৎসাহে)। বাঃ, এতক্ষণ কী চমৎকার সব কথা হ'লো। তুমি যদি শুনতে, মীরা।

লোকটা (একেবারে অন্য রকম সুরে)। আমি কেন এসেছিলুম তাও আপনাকে বলি। এসেছিলুম চুরি করতে।

মীরা (হঠাৎ হেসে ফেলে')। চুরি করতে! আমাদের বাড়িতে!

হেমন্ত (উৎফুল্লস্বরে) এই তো! আমিও এঁকে তাই বলছিলুম। তবে জানো—ড্রয়ার খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একটা টাকা পেয়ে গেছি। কবে রেখেছিলে মনে আছে?

মীরা (মুচকি হেসে)। তবু ভাগ্যিস্ কিছু পাওয়া গেলো।

হেমন্ত। অনেক বলে'-কয়ে' টাকাটা এঁকে নিতে রাজি করিয়েছি। অবিশ্যি বুঝতে পারছো ইনি এখন খুব আর্থিক সচ্ছলতায় নেই।

মীরা। দার্শনিকরা কখনোই থাকেন না। তুমি নিজেও তো ছোটখাটো একজন দার্শনিক।

হেমন্ত। ওঃ, এঁর সঙ্গে তুলনা হয় না। এঁর হচ্ছে একেবারে জীবন-দর্শন—জীবনকে দেখা।

মীরা। আপনি বসুন না।

লোকটা (প্রায় রুদ্ধস্বরে)। কেন আপনারা আমাকে ও-রকম করে' কষ্ট দিচ্ছেন?

হেমন্ত (লোকটার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে)। না-হয় বসলেনই একটু। ভয় কী? আমরা সবাই মানুষ।

লোকটা (দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে' রইলো)।

[একটু চুপচাপ]

হেমন্ত (একবার আড়মোড়া ভেঙে)। আঃ! বাঁচতে ভালো লাগে।

মীরা। ভোর হ'য়ে এলো।

হেমন্ত। এখন চা খেলে কেমন হয়?

মীরা। যাচ্ছি।

হেমন্ত। আর শোনো—কিছু খাবার দিয়ো' সঙ্গে। (দ্রুত দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকালো।)

মীরা। নিশ্চয়ই। দেশলাইটা দাও তো।

[হেমন্তর হাত থেকে দেশলাই নিয়ে মীরা চলে' গেলো।]

হেমন্ত (লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে, লঘুস্বরে)। কী আর হবে। এতক্ষণই যখন বসতে পারলে, আর একটু বসে'ই যাও।

লোকটা (হাত সরিয়ে নিয়ে অদ্ভুত, পাংশু এক মুখ উন্মোচন করে')। কিন্তু এ আমি কখনো ভাবতে পারিনি।

স্ত্রী

সাড়ে-আটটা, এইমাত্র ঘুম থেকে উঠলুম। চায়ের ট্রেটা নিয়েছি বিছানায় টেনে, লেপ থেকে হাত বার করবার কুঁড়েমিতে চা ঢালা হচ্ছে না এখনো। ঘুম-ভাঙা চোখে তাকিয়ে আছি খোলা জানলা দিয়ে, আকাশ রোদে-কুয়াশায় জড়ানো। পাশে পড়ে' আছে ভাজ-না-খোলা খবরের কাগজ।

এমন সময়ে কিনা আমার বিখ্যাত মকর এসে বললে, 'কে একজন ডাকছে।'

'উঁ?'

'একজন বাবু—বাইরে দাঁড়িয়ে।'

রাণু বলে' উঠলো, 'কী আপদ্! ভোর না হ'তেই ডাকাডাকি কেন?'

আমি হেসে বললুম, 'সকলের দিন একরকম কাটে না—এমন আশ্চর্য লোকও আছে, যারা সাড়ে-আটটার সময় দাড়ি-কামানো, স্নান এবং আহার সেরে আপিসে বেরিয়ে যায়। যাই, দেখে আসি কে এই মূর্তিমান্ রসভঙ্গ।'

'বলে' দাও না অন্য সময়ে আসতে! চা যে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে এদিকে।'

'এই এক মিনিট,' বিছানা থেকে নেমে আমি ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে নিলাম। 'মনে হচ্ছে যেন সেই বঙ্গবীর কাগজ থেকে এসেছে—লেখা চাই।'

'গিয়ে হয়-তো দেখবো ইন্সিওরেন্সের দালাল।'

গিয়ে যা দেখলাম, তাতে তা-ই মনে হ'লো প্রথমটায়। বিলিতি পোষাক-পরা সু-দর্শন ভদ্রলোক, হাতে চামড়ার পোর্টফলিও। আমাকে দেখে হাত তুলে অভিবাদন করলেন আধা-বিলিতি কায়দায়। আমি জিজ্ঞাসু চোখ তুলে চাইতেই বললেন, 'আমি আপনার পাশের ফ্ল্যাটে থাকি—'

'ও'। আমার কণ্ঠস্বরে কিছুটা ঠাণ্ডাভাব প্রকাশ পেয়ে থাকবে নিশ্চয়ই, কেন না সকলেই জানে যে আমার নিজের পরিবেষের বাইরের বাইরে যে-জগত, সে-সম্বন্ধে স্বভাবতই আমি উদাসীন। রাণু বলছিলো বটে সেদিন, পাশের ফ্ল্যাটে কে নতুন ভাড়াটে এলো বুঝি। কথাটাকে কান দেয়ার মত মনে করিনি।

ভদ্রলোক বাহুর এমন একটা ভঙ্গি করলেন, যাতে বোঝা গেলো যে আমার সঙ্গে বসে' দু' দণ্ড বিশ্রম্ভালাপ করা তাঁর ইচ্ছা। সুতরাং আমি দরজাটাকে আড়াল করে' দাঁড়িয়ে ক্ষীণস্বরে বললাম, 'তা—'

'আপনার লেখা আমি অনেক পড়েছি,' ভদ্রলোক দ্রুতস্বরে বলতে লাগলেন। 'আপনি যে-সব বিষয় লেখেন—'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আপনি বুঝি ইন্সিওরেন্স-লাইনে?' আসল কথাটা চুকে গেলেই মঙ্গল।

'বিজ্‌নেস-এর লাইনে আছি, ষ্টক এক্সচেঞ্জে ঘোরাঘুরি করি, নানারকম ফাঁদ পেতে রাখি ভাগ্যের জন্য—একদিন যদি ধরা পড়ে।' আগন্তুক কাঁপা গলায় হেসে উঠলেন। 'তা আপনার বই-টই অনেক পড়েছি, খুব ভালো লাগে, ভারি জোয়ালো লেখা। মরা দেশটাকে ঝাঁকুনি দিয়ে—'

আমি হাসবার চেষ্টা করে' বললুম, 'তা বেশ, আসবেন আর-এক সময়—'

ভদ্রলোক একটু যেন সঙ্কুচিত হলেন। 'Oh, am I in the way? একটা কথা শুধু—আপনার বইগুলোর বিশেষত্বই এই যে ওগুলো পুরোমাত্রায় সাইকলজিকল্—তাই কিনা, বলুন? সাইকলজি নিয়ে আমিও নাড়াচাড়া করেছি একটু-আধটু—রাঁচির বার্কলি হিল সাহেব আমাকে পিতার মত স্নেহ করেন।' ভদ্রলোক একটু থামলেন, শেষের কথাটা যাতে আমার মনে ভালো করে' বসতে পারে।

আমি রইলাম নিরুত্তর, ঠাণ্ডায়মান চা ও অপেক্ষমান রাণুর কথা মনে পড়ে' ভিতরটা একবার অস্থির হ'য়ে উঠলো।

'তা ছাড়া, আমার জীবনে অভিজ্ঞতাও হয়েছে নানারকমের —নানা ঘাটের জল খেয়েছি, নানারকমের মানুষ ঘেঁটেছি—' ভদ্রলোক চোখটা একটু মিটমিট করলেন, যাতে বোঝা গেলো কথাটার পিছনে অনেক-কিছু আছে। 'সে-সব কথা একদিন সময়-মত আপনাকে বলবো, হয়-তো তা নিয়ে একটা নভেল তৈরি করতে পারবেন।'

এই ধরণের প্রস্তাব জীবনে এই প্রথম নয়: বরফ হ'য়ে রইলাম। 'সে অনেক সব মজার-মজার কথা' ব'লে ভদ্রলোক আর-একবার শিথিলভাবে হেসে উঠলেন।

ঘরে ফিরে আসতেই রাণু বলে' উঠলো 'বেশ লোক! চা কি আর এতক্ষণ আছে।'

ফ্ল্যানেলের টুকরো দিয়ে জড়ানো টী-পট থেকে চা ঢেলে নিয়ে বললুম, 'কেন, বেশ গরম তো আছে।'

'কী ব্যাপার? লেখার offer?'

খবরের কাগজটা খুলতে-খুলতে বললুম, 'লেখার offerই বলতে পারো। তবে সম্পাদকের নয়, চরিত্রের।'

'তার মানে?'

'A character in search of an author. ভদ্রলোক জীবনে অনেক প্রেম করেছেন, আমাকে তার গল্প লিখতে হবে।'

রাণু হেসে উঠলো।—'তুমি কী বললে? কে—কে এই বিবেক-পীড়িত প্রেমিক?'

'আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে থাকেন তিনি।'

'ও, বলিনি সেদিন তোমাকে? জানলা থেকে দেখলুম, ট্যাক্সি থেকে নামছে মাল-পত্র নিয়ে। টকটকে লাল চেহারা।' নতুন বিলেত-ফেরৎ বুঝি?'

'সে-কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে' গেছি। তবে হাবে-ভাবে একটু মস্তিষ্ক-বিকৃত মনে হ'লো। রাঁচির বার্কলি হিল সাহেব নাকি ওঁর বাপের মত। বার্কলি হিল-এর আশ্রমেই একদিন গিয়ে উঠতে হবে হয়-তো ওঁকে।'

'বলো কী! পাশের ফ্ল্যাটে একটা জ্যান্ত পাগল! বলতে গেলে একই তো বাড়ি।'

আমি সিগ্রেট ধরিয়ে বললুম, 'মা ভৈঃ! মানুষ দেখলেই কামড়াবার অবস্থা শিগ্‌গির হবে এমন মনে হয় না।'

* *

*

কয়েকদিন পর, দুপুরবেলা খেতে বসেছি—শোনা গেলো পাশের ফ্ল্যাট থেকে উচ্চ ক্রুদ্ধ স্বর। ইংরিজি-বাঙলা-হিন্দি মেশানো নানারকম গালাগালের অকৃপণ বর্ষণ। রাণু ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে থমকে গেলো—'শুনছো?'

'শুনছি তো।'

'এ-রকম রোজই করে। চাকরটা তবু যে টি'কে আছে, তা-ই আশ্চর্য্য।

'বোধ হয় দু' হাতে লোটবার সুযোগ পায়—ওগুলোকে ফাউ পাওনা মনে করে আর কি! সাইকলজিস্ট্ মহোদয় নিঃসঙ্গবাস করছেন সম্ভবত।'

'বাড়িতে কোনো মেয়ে আছে বলে' তো মনে হয় না।'

'কাজেই বুঝতে পারছো—ডোমেস্টিক এনার্কিতে ভৃত্যেরই প্রভুত্ব।'

রাণু একটু চুপ করে' থেকে বললে, 'যা-ই বলো, আমার ভালো লাগে না।'

ইতিমধ্যে আমার মন চলে' গিয়েছিলো অন্য জায়গায়, জিজ্ঞেস করলুম, 'কী ভালো লাগে না?'

'ঐ লোকটাকে।'

'আমার তো মনে হয় এখন পর্য্যন্ত তোমার তাকে ভালো কি মন্দ কি কোনো-কিছু লাগবার কথাই ওঠে না।'

'চুপ করো, সব সময় ফাজলেমো ভালো লাগে না। বাড়িওয়ালারই বা বুদ্ধি কী—ও-রকম একটা পুরুষমানুষকে কী বলে' ফ্ল্যাটটা ভাড়া দিলে!'

আমি হেসে উঠলাম।—'বাড়ি ভাড়া পাওয়াই যা মুস্কিল তার উপর যদি সেই সঙ্গে আত্মীয়া সংগ্রহ করতে হয়—'।

'তুমি কিছু বোঝো না, চুপ করো,' রাণু মাথা-ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো। 'মা কি স্ত্রী কেউ না থাকলে কলকাতায় বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না, জানো না? সেই যে শচীন-দা গল্প বলেছিলেন, মনে নেই?—'

'তা সে-বাড়িওয়ালার তো ছিলো তৃতীয় পক্ষের যুবতী স্ত্রী।'

'তা না-থাকলেই বুঝি যেখান-সেখান থেকে আস্ত একটা পুরুষমানুষ কুড়িয়ে এনে বাড়িতে তুলতে হবে! তোমাদের এই মিরজা সাহেবের কাণ্ডটা ত্যাখো!'

'মিরজা সাহেবকে দোষ দিতে পারিনে—একক পুরুষমানুষের কাছ থেকে ভাড়া পেলে টাকার অঙ্কটা কমে' যায়, এমন কথা ইকনমিক্সের বইয়ে লেখে না। তা ছাড়া, পুরুষমানুষকেও তো থাকতে হবে—আস্ত ভগ্নাংশ যা-ই হোক্।"

'কতগুলো জিনিস তোমরা কিছুতেই বুঝবে না—ঈশ্বর তোমাদের তেমন করে'ই গড়েননি।—ও কী, উঠছো নাকি?'

'সময় নেই আর।' প্রতিদিন এই সময়টায় ঘড়ির নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা মনে পড়ে' গেলো।

'দই—দই খেলে না তো। একটু বোসো।'

দইয়ের ব্যাপারটা যথাসম্ভব অল্প সময়ে শেষ করে' দেবার চেষ্টা করছি, এমন সময় মধ্যবর্তী দেয়ালের ওপার থেকে আবার তারস্বর শোনা গেলো। ক্রোধের মাত্রা চড়লে অসংযত রসনা

ভৃত্যকে যে-সব সম্বোধন করে তা সকলেরই জানা আছে, সে-গুলোর পুনরাবৃত্তি না-ই করলাম। পরিশেষে কয়েকটা চড়-চাপড়ের অপেক্ষাকৃত মৃদু আওয়াজও শ্রুতিগম্য হ'লো।

রাণুর মুখ কালো হ'য়ে গেলো।—'দেখলে! চাকরকে যে কথায়-কথায় মারতে পারে, সে কখনোই ভালো লোক নয়।'

'সম্পূর্ণ সায় দিচ্ছি তোমার কথায়', শেষ ঢোঁক জল খেয়ে নিলুম। 'কিন্তু পৃথিবীটা কেবল ভালো লোকের থাকবার জায়গা এ-ধারণা মন থেকে যত শিগ্‌গির তাড়াতে পারো ততই মঙ্গল।'

আমার সঙ্গে-সঙ্গে রাণুও উঠে পড়লো। বলতে আরম্ভ করলো, 'যাচ্ছো তো কলেজে, পাশে এমন একটা—'

তাড়াতাড়ি বললুম, 'ভয় করে তো দরজা বন্ধ করে' থেকো।'

'এই হৈ-চৈ হল্লাই বা কত ভালো লাগে।'

'কিন্তু একপাল মেয়েমানুষ যদি থাকতো—তাহ'লে একবার ভাবো অবস্থাটা!'

'চাকরটাও আশ্চর্য্য—একটা কথা বললে না।'

'নাও—এবার পান দাও তো একটা। ও—এই তো! চাদরটা আবার কী হ'লো? আর সেই যে বইটা—না, পয়সা আছে—দাঁড়াও, দেখছি—না, আর লাগবে না—'

উর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে পড়লুম—দিনের পাপক্ষয় করতে। প্রতিদিন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে জীবিকার্জ্জনের হীন প্রয়োজনে যাদের বাস্ ধরতে ছুটতে হয়, ঈশ্বর যেন তাদের দয়া করেন।

* *
*

কলেজ থেকে ফিরে দেখি, আমার ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ। ধাক্কা দিলুম, জোরে ধাক্কা দিলুম। হাতে দুটো মোটা-মোটা বই। তিন ঘণ্টা একটানা চ্যাঁচানো। তারপর বাস্—এই ধুলো, ভিড়, ঝাঁকুনি। তারপর এই সিঁড়ি বেয়ে তেতলায় উঠে দাঁড়িয়ে থাকা!

খুট করে' শব্দ হ'লো, আর-একবার ধাক্কা দিতেই হাঁ হ'য়ে গেলো দরজা। ঘরে ঢুকে প্রথম কাউকে দেখতে পেলুম না। তারপর রাণুকে দেখলুম কপাটের আড়ালে দাঁড়ানো।

'ও, তুমি!' রাণু নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে।

'আমিই তো। ঘুমুচ্ছিলে নাকি?'

রাণু মাথা নাড়লে।

'তবে?' রাণুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন অদ্ভুত লাগলো। 'হয়েছে কী তোমার? পাগল হ'লে নাকি?'

রাণু রুদ্ধস্বরে বললে, 'এসেছিলো।'

মেজাজের মার্কারি ক্রমশই চড়ছিলো, চাপা দেবার চেষ্টা করে' বললুম, 'কে এসেছিলো? কেন এসেছিলো? কখন্ এসেছিলো? ভালো করে' কথাই বলো না!'

রাণু কিছু না-বলে' আঙুল তুলে পাশের ফ্ল্যাটের দিকে দেখালো।

'ও, এই কথা! ভেবেছিলাম বুঝি একটা ভূত-টুতই এলো দিনে-দুপুরে। রাণুর আবার একটু ভৌতিক ঝোঁক আছে। চাদরটা খসিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। ইজি-চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বললুম, 'সাইকলজিস্ট্ মহোদয় এসেছিলেন বুঝি আবার? তা চা নিয়ে এসো—শুনছি সব।'

'মকরকে কখন্ পাঠিয়েছি চিনি আনতে এখনো যদি ফেরে!'

'হয়-তো একবার দরজায় টোকা দিয়ে ফিরেও গেছে—কে জানে! আমি তো ঢুকতে পেরেছি নিতান্ত কপালগুণে।'

'যা চমক লাগিয়েছিলো, জানো না তো!' এতক্ষণে রাণুর মুখ-চোখের স্বাভাবিক ভাব ফিরে এলো। 'হঠাৎ দুপুরবেলা একেবারে ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত—'

'তা বাইরের ঘর তো লোক আসবারই জন্যে—'

'দুপুরবেলা ওর কী আসবার দরকার শুনি? জানে তো তুমি বাড়ি থাকো না। এসে বলে, মিস্টার, মিটার আছেন?

মকর বললে, নেই। তারপর বলে, মিসেস মিটার? মকর একটু ভেবে বললে, তিনি আছেন। খবর দাও তাঁকে এক্ষুনি, দরকার আছে। কী চড়া গলার কথা, যদি শুনতে! আমার কানে সব কথাই আসছিলো—মাগো, সে কী বুকের ধড়-ফড়ানি, এখনো ভাবলে দম আটকে আসে। আমি মকরকে বললুম, হতভাগা, তোর একটু বুদ্ধি নেই, বলে' দে মিসেস মিটার ঘুমুচ্ছেন, এক্ষুনি চলে' যেতে বল্। তারপর মকরের সঙ্গে আরো যেন কী সব কথা হ'লো। তারপর এই এতক্ষণ আমার কী ভাবে যে কেটেছে—'

'একটু অসাধারণ ব্যবহার, সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন বিচলিত হবারই বা কী আছে? হয়-তো কোনো দরকারেই এসেছিলো—কে জানে। দিনে-দুপুরে তোমাকে তো আর খেয়ে ফেলতো না।'

'দরকার না আরো কিছু! বদ, লোকটা নিতান্ত' বদ না-হ'য়েই যায় না।'

'নির্ব্বোধ যে, এটুকু বোঝা গেছে। নাও, ছাখো এখন মকর এলো কিনা চিনি নিয়ে।'

সন্ধেবেলাটা বন্ধুসমাগমে হাসিতে গল্পে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। দূরে গেলো সব ভাবনা, খুসিতে গলে' গেলো রাণুর ভয়, নিকটতম প্রতিবেশী আমাদের সাইকলজিস্ট্ জীবনের অন্ত লক্ষ তুচ্ছতার সঙ্গে কোথায় হারিয়ে গেলো।

কিন্তু কয়েকঘণ্টা পরেই উগ্র রূঢ়তায় সে ফিরে আসবে তা তখন অবিশ্যি ভাবতে পারিনি।

রাত তখন ঠিক ক'টা হবে বলতে পারবো না, তবে ট্র্যাম থেমে গেছে, সমস্ত রাস্তা চুপচাপ, শীতকালের পক্ষে বেশ গভীর রাতই হবে। হঠাৎ একটা গোলমালে ঘুম ভেঙে গেলো। পাশের ফ্ল্যাট থেকে আসছে বীভৎস বমির শব্দ আর সঙ্গে-সঙ্গে উচ্চস্বরে অসংলগ্ন প্রলাপ। পাশে তাকিয়ে দেখি, রাণুর চোখ খোলা, অন্ধকারেও বুঝতে পারলুম, তার সমস্ত মুখ একেবারে ছাই হ'য়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করলুম, 'কখন্ জেগেছো ?'

রাণুর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, থর্‌থর্ করে' কাঁপছে সে। শক্ত করে' আঁকড়ে ধরলো আমাকে।

একটু অবাক না-হ'য়ে পারলুম না, প্রলাপের মধ্যে যখন আমার নাম শোনা গেলো।—'ওঃ, ঐ যে নীলকণ্ঠ মিত্তির—ভারি তো! অপমান করেছে, নীলকণ্ঠ মিত্তিরের স্ত্রী আমাকে অপমান করেছে! দেখে নেবো, দেখে নেবো —ভারি তো প্রোফসরি করেন, দেবো ভাইস্ চ্যান্স্‌লারকে বলে' চাকরি ছুটিয়ে! He is my friend, he is my friend! আমার বাপ ছেল আশুবাবুর পেয়ারের ছাত্র—কে না জানে! I dined with the Lord Chief Justice last Tuesday. Good-evening, good-evening, gent—' একটা

নিদারুণ উদ্গারে কথা চাপা পড়ে' গেলো। একটু পরে আবার সুরু হ'লো বিকার: সব কথা বুঝতে পারলুম না, কিন্তু থেকে-থেকেই আমার নাম আর ভাইস্‌চান্স্‌লারকে বলে' আমার চাকরি ছুটিয়ে দেবার সঙ্কল্প শোনা যেতে লাগলো। ব্যাপারটা সব সুদ্ধ কিন্তু পনেরো-কুড়ি মিনিটের বেশি সময় নেয়নি; আরো দু' একবার বমি, তারপর কণ্ঠ এলো নির্জীব হ'য়ে, তারপর থেমে গেলো, তারপর একেবারে চুপচাপ।

বললুম, 'যাক্, সাইকলজি থেকে আরম্ভ করে' সবই বোঝা গেলো।'

রাণু ফিস্‌ফিস্ করে' বললে, 'মাতাল!' এমন সুরে বললে যেন নিম্নতম নরকের গন্ধকবাষ্পময় কোনো রহস্য উদ্ঘাটন করছে।

'আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিলো! মুখের' ঐ অ্যালকহল-লালিমাই তো স্বতঃস্ফূর্ত।'

রাণু একরকম অদ্ভুত অশরীরী স্বরে বলতে লাগলো, খাবার ঘরের ওখানটায় তো দেয়ালও নয়, ক্যানভাসের পার্টিশন, ইচ্ছে করলে কেটে ফেলতে কতক্ষণ। আর এই তো পাশাপাশি জানলা, তায় শিক নেই, অনায়াসে মাথা গলিয়ে দিয়ে চলে' আসা যায়। যে মদ খায় সে সব পারে, সব পারে!'

রাণুকে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে মদ যে খায়, সে সব সময়েই মদ খায় না, এবং প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সে মোটামুটি অন্যান্য মানুষের মতই। এবং যখন তার উন্মত্ত অবস্থা তখন দেখতে সে যতই ভয়াবহ হোক্, আসলে সে মোটেই ভয়াবহ নয়, বরং কৃপার পাত্র—কারণ তখন তার মত দুর্ব্বল, অক্ষম পৃথিবীতে আর-কেউ নয়, একটা ধাক্কা দিলে লুটিয়ে গড়াগড়ি যাবে। কিন্তু আমি যতই বোঝাই, রাণুর হাত-পা ততই ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে, তার চোখ স্ফীত হয়, ততই তার শরীর থেকে-থেকে ঝেঁকে ওঠে। পরিশেষে সে বললে, 'লোকটাকে যদি এখান থেকে তুলতে পারো তো ভালো, নয় তো আমরাই যাবো অন্য বাড়িতে।'

বলতে বাধ্য হলুম, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তা-ই যাবো। তুমি এখন ঘুমোও তো।'

কিন্তু রাণু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমোতে পারলো না, সুতরাং আমিও ঘুমোতে পারলুম না। কোথাও খুট্ করে' একটু শব্দ হয় কি চমকে ওঠে—উঁ? জানলার দিকে তাকাতে পারে না। মশারিতে কিসের ছায়া দেখে। ইত্যাদি, ইত্যাদি সে অনেকরকম। একটা ভয়ের রাস্তা দিয়ে যত অশরীরী অন্ধ ছায়া-ভয় ভিড় করে' এলো ওর মনের মধ্যে।

সমস্ত কথা বলবো না, এটুকু জেনে রাখুন সে-রাত্রে আবার যখন ঘুমোলাম, টালিগঞ্জের থানায় ঢংঢং করে'

চারটে বাজলো। ঘুমোবার সময়ে প্রতিজ্ঞা করলাম, কাল সকালে উঠে মিরজা সাহেবের সঙ্গে দেখা করা প্রথম কাজ। ব্যাপারটা ভারি বিশ্রী, সত্যি বলতে।

* *

*

পরের দিন রবিবার। সকালে উঠে গতরাত্রির প্রতিজ্ঞার কথা আমি ভুলে'ই গিয়েছিলাম, কিন্তু রাণু চায়ের পরেই মনে করিয়ে দিলে, 'কই, যাও একবার বাড়িওয়ালার কাছে।'

আমি চোখ তুলে বললুম, 'ও!'

'ও মানে? এক্ষুনি যাও—দেরি করলে কি আর দেখা পাবে!'

রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারে ভয়ে-শুকিয়ে-যাওয়া স্ত্রীকে নিয়ে যে-ব্যাপারটা দুঃস্বপ্নের মত ভীষণ লেগেছিলো, বলা বাহুল্য সকালবেলার আলোয় তা ঈষৎ বিরক্তিকর এবং খানিকটা হাস্যকর একটা উপসর্গের বেশি কিছু মনে হ'লো না। তা ছাড়া, আমি মানুষটা যাকে বলে মোটেও প্র্যাক্‌টিক্যাল্ নই: কোনো 'কাজের' কথা নিয়ে কারো সঙ্গে দেখা করবার,

কথা বলবার, বচসা করবার কথা ভাবলেই আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তা ছাড়া, ভাবুন, এমন একটা রবিবারের সকালবেলা ঈশ্বর কি তৈরি করেছিলেন বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করতে? ভেবে-চিন্তে বললুম, 'দাঁড়াও, চিঠি লিখি।'

এই না বলে' কলম নিয়ে বসে' নিদারুণ কড়া ইংরিজিতে ঝরঝর করে' এক চিঠি লিখে ফেললুম। সকলেই জানে, লেখাটা আমার আসে—আমিও জানি। কেননা সেই চিঠিতে আহত ভদ্রজ্ঞানের যে-উষ্মা, পুরুষোচিত যে-দর্প, যে-বিক্রমান্বিত সঙ্কল্প, এবং সর্ব্বোপরি নিয়মিত ভাড়া-দিয়ে-যাওয়া ভাড়াটের যে-তীব্র স্বাধিকার-জ্ঞান অল্প কয়েকটা কথাতে প্রকাশ করতে পারলুম, মুখোমুখি আলাপে একঘণ্টা ধরে'ও তার শতাংশ প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। সব দিক থেকেই এটা ভালো হ'লো। চিঠিটা মকরের হাতে পাঠিয়ে দিয়ে জয়ী যোদ্ধার আত্ম-তৃপ্ত প্রশান্তি নিয়ে ইংরিজি কবিতার নতুন এক চয়নিকার পাতা ওল্টাতে বসলুম।

চিঠির ফল ফললো: দুপুরবেলা স্বয়ং মিরজা সাহেব দরজায় টোকা দিলেন। পাঞ্জাবি মুসলমান, ঠোঁটের দু'দিকে ঝুলে-পড়া পুরু গোঁফ, বেলুনের মত ভুঁড়িটি। শ্লথভাষী, আয়েসি ভালোমানুষ, ঈশ্বরের দয়ায় কিছুরই অভাব নেই; বিস্তর পয়সা, চারটে গোরু মোষ, ছেলেপুলে সম্ভবত বাইশটি,

রোজ সকালে দুটো মোটার বোঝাই করে' চার কিস্তিতে তারা ইস্কুলে যায়। সাহেবের সঙ্গে খানিকক্ষণ খুব তৃপ্তিকর আলাপ হ'লো। কাটা-কাটা ইংরিজিতে তিনি যা বললেন তার মর্ম্মাংশ এই: 'রিয়লি! ও রিয়লি! তাই তো, কী অন্যায়। এর ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। এখুনি দেখছি। আসুন একটু আমার সঙ্গে।'

গেলুম তাঁর সঙ্গে পাশের ফ্ল্যাটের দরজায়, কিন্তু আসন্ন অপ্রিয়-প্রসঙ্গে ভিতরে-ভিতরে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলুম। মিরজা সাহেব দরজায় টোকা দিলেন, তারপর ধাক্কা দিলেন, কিন্তু দরজা খোলা দূরে থাক্, ভিতর থেকে একফোঁটা সাড়া এলো না। ভাবটা এমন বাড়িতে যেন কেউ নেই। আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'থাক্, থাক্ তাহ'লে এখন— হয়-তো ঘুমুচ্ছে, হয়-তো বেরিয়ে গেছে—'

মিরজা সাহেব তবু দু' একবার ডাকাডাকি করলেন, ফল হ'লো না কোনো। অগত্যা তাঁকে বলতে হ'লো, 'আচ্ছা পরে আমি দেখবো। আবার কোনোরকম গোলমাল করলে জানাবেন—'

'নিশ্চয়ই, 'নিশ্চয়ই', মিরজা সাহেবকে আর-কিছু বলতে না-দিয়ে আমি স্বগৃহে ফিরে এলুম—বাঁচলুম হাঁফ ছেড়ে।

রাণু দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলো, ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, 'কী হ'লো?'

'মিরজা সাহেব বললেন ব্যবস্থা করে' দেবেন।'

'লোকটা কিছু বললে?'

'লোকটা? ও, সাইকলজিস্‌ট্? দেখা পেলুম না।'

'দেখা পেলে না কী-রকম?'

'অনেক ডাকাডাকি ধাক্কাধাক্কিতেও দরজা খুললো না।'

'ছ্যাখো, কী পাজি! নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে—গা-ঢাকা দিয়ে আছে। তুমি বাড়িওয়ালাকে বললে তো ওকে নোটিশ দিয়ে তুলে দিতে?'

'ও কিছু বলতে হবে না—ভেবো না কিছু—কই, এখানে যে-বইটা ছিলো—' অলক্ষিত পদক্ষেপে আমার ইজি-চেয়ারের দিকে এগোতে লাগলুম।

'নাঃ, এ-রকম মানুষ নিয়ে কী করে' চলে!' বলা বাহুল্য, বলতে-বলতে রাণুর চোখ বিস্ফারিত হ'লো, ঠোঁট কুঞ্চিত হ'লো, উত্তেজনায় কণ্ঠস্বর অপরূপ হ'য়ে উঠলো। আরো যে সব কথা আমাকে শুনতে হ'লো, তা আর এখানে না-ই বললুম। গতরাত্রির ঘটনার পুনরাবৃত্তি আজ যদি হয় তাহ'লে কাল সকালে উঠেই অন্য বাড়িতে যেতে হবে—যেখানেই হোক্ এবং যেমন করে'ই হোক্—এই শেষ কথা শুনে আমি ইজি-চেয়ারে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লুম।

ঈশ্বর দয়া করলেন, সে-রাতটা ভালোই কাটলো। পাশের ফ্ল্যাট থেকে টুঁ শব্দ নেই। পরের দিনটাও কাটলো অসাধারণ

চুপচাপ, ভিতরে যে কোনো মানুষ আছে এমন এতটুকু লক্ষণ দেখা—মানে, শোনা—গেলো না।

রাত্রিতে খেতে বসে' প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতে সাহস পেলুম, 'রাতারাতি কী আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, দেখলে!'

'যাই বলো', রাণু বললে, 'আপদ বিদেয় না-হওয়া পর্য্যন্ত শান্তি নেই। তা তোমার মুখ দিয়ে একটা কথা ফোটে না তো কী হবে!'

এমন সময়ে আমার বিশ্বস্ত মকর—যে কিনা টেবিলের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো, এবং যার এতদিনে এটুকু অধিকার জন্মেছে যে আমাদের কথার মধ্যে মাঝে-মাঝে দু' একটা মন্তব্য করতে পারে—এমন সময় মকর বললে, 'ও-বাবু তো চলে গেছেন।'

'চলে' গেছেন!' রাণু প্রায় চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলো। 'কখন্ গেলেন?'

'কাল সকালে ট্যাক্সিতে চলে' গেলেন—সঙ্গে একটা স্যুটকেস্।'

এত বড় একটা শুভ-সংবাদ চট্ করে' বিশ্বাস করবার সাহস পেলুম না। জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি দেখেছো?'

'আমি দেখিনি, তেতালার সুবোধবাবুর চাকর দেখেছে। চলে'ই গেছেন', মকর খুব সরলভাবে মন্তব্য করলে, 'নয় তো কোনো গোলমাল কি না হ'তো!'

'কী, একবারে ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে চলে' গেছেন?' রাণু উৎসাহের ঝোঁকে খেতেই প্রায় ভুলে' গেলো।

'কী জানি', আকাঙ্ক্ষিত একটা সংবাদ দিতে পেরে মকর তৃপ্তভাবে একটু হাসলো, 'দরজা তো ভিতর থেকেই বন্ধ দেখি সব সময়।'

রাণুর মুখে আবার ছায়া পড়লো।—'চাকর রেখে গেছে আর কি—কোন্‌দিন আবার ফিরে আসে দ্যাখো না!'

মকর বললে, 'কই চাকরও তো কাউকে দেখিনে!'

আমি বললাম, 'বাড়িওয়ালা কিছু বলেছে বোধ হয়, সম্প্রতি অন্য কোথাও উঠে গেছে—সুবিধে পেলেই জিনিসপত্র সব নিয়ে যাবে।'

'আহা!' রাণু বলে' উঠলো, 'তাহ'লে কি বাইরে থেকে তালা থাকতো না দরজায়? কী বুদ্ধি তোমার।'

লজ্জিত হলুম। কোনো কথা খুঁজে পেলুম না—মাথা নিচু করে' খেতে লাগলুম।

'কে জানে', রাণু বলতে লাগলো, 'লুকিয়ে এখানেই হয়-তো আছে চুপচাপ। ট্যাক্সি নিয়ে বেরোলেই তো আর যাওয়া হ'লো না! হয়-তো দিনের বেলা এখানে-ওখানে কাটায়, রাত্তিরে চুপে-চুপে এসে শুয়ে থাকে। কয়েকটা দিন ঠাণ্ডা আছে, কিন্তু বিশ্বাস কী? মাতাল যে, সে সব পারে।'

প্রত্যেকটি কথাই যুক্তিসাপেক্ষ, প্রতিবাদ করা চলে না।

এক ঢোঁক জল খেয়ে নিয়ে বললুম, 'তা দ্যাখোই না, যদি চুপচাপ থাকে—একদিন ও-রকম করেছে বলে' রোজই তো আর—

'তোমার এই ভালোমানুষির অর্থ হয় কোনো? গায়ে-গা-লাগা ফ্ল্যাট—এক বাড়ি বললেই চলে—মাগো!' নানারকম কাল্পনিক আশঙ্কায় রাণু একবার শিউরে উঠলো।

'তা একরকম চলেই তো গেছে—এখন আর ভাবছো কেন? বেচারাকে অন্য বাড়ি খুঁজে বার করতেও কয়েকটা দিন সময় দেবে তো।'

'সময় আবার কী? এমন লোক যে, সে রাস্তায় থাকবে। আমি বাড়িওয়ালা হ'লে তো সেই রাত্রেই গলাধাক্কা দিয়ে বার করে' দিতুম।'

এখানে রাণুকে মনুষ্যধর্ম্মের মূলনীতি সম্বন্ধে কয়েকটা সারবান কথা বলতে পারতুম, কিন্তু এটা-ওটা ভেবে বিরত হলুম। যা-ই হোক্, এর পরের দিনগুলো বেশ চুপচাপ কাটতে লাগলো, এবং এটা লক্ষ্য করে' আনন্দ বোধ করলুম যে রাণুর মন আর মুখ থেকে তার এই নতুন ভয়ের ছায়া অপসৃত হয়েছে।



ইতিমধ্যে ক্রিসমাসের ছুটি এসে পড়লো, শীতের সোনালি দিনগুলো উৎসবের রসে ভরে' উঠলো। ঘুরে বেড়ালুম দু'জনে, এখানে-ওখানে, যেখানে-সেখানে, মকরের আশ্রয়ে ফ্ল্যাটটা ফেলে রেখে দিনের বেশির-ভাগ সময় বাইরে-বাইরেই থাকতুম কলকাতার ভিতরে থেকেই যে ভ্রমণের সমস্ত উত্তেজনা, আনন্দ ও ক্লান্তি উপভোগ করা যায়, এই একটা নতুন অভিজ্ঞতা হ'তে লাগলো।

সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের নিমন্ত্রণ ছিলো টাউন হল্-এ ব্রজ-মাধুরী সঙ্ঘের কীর্তন শুনতে—ফিরতে-ফিরতে রাত দশটা হ'লো। এক প্রকাশকের আসার কথা ছিলো, তাঁর জন্যে বসবার ঘরের টেবিলের উপর একটা চিঠি রেখে গিয়েছিলাম, তাঁর বক্তব্য যেন এই প্যাডের কাগজে লিখে রেখে যান। ফিরে এসে মকরকে প্রথম কথা জিজ্ঞেস করলাম কোনো ভদ্রলোক এসে-ছিলেন কিনা, এবং মকর কাঁপতে-কাঁপতে অনেকগুলো কথা বললে, তার মর্ম্মাংশ এই :

সন্ধের পর মকর রান্না করছে, হঠাৎ ঘরে ঢুকলো—পাঠক

নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন কে—সায়েবি পোষাক পরা, টকটকে লাল মুখ, পা টলছে। ঢুকেই চীৎকার করে' বলতে লাগলো, 'বোলাও--মেমসাবকো বোলাও—জলদি।' মেমসাব বলেছিলো, এটা মকরের স্পষ্ট মনে আছে। বলে'ই ঢুকলো শোবার ঘরে, তারপর ফিরে এসে ছোঁ মেরে টেবিলের উপর থেকে রাইটিং প্যাডটা তুলে নিয়ে এক ছুট। আমার বিখ্যাত মকর এককোণে দাঁড়িয়ে থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগলো। 'বেচারা জন্মেও বোধ হয় এমন চমক খায়নি; এখনো, বুঝতে পারলুম, সে ঠিক সামলে উঠতে পারছে না।

রাণুর বোধ হয় ফিট হবার জোগাড়, কিন্তু রাণুর দিকে মন দেবার সময় তখন আমার ছিলো না। মুহূর্ত্তে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে' গেলো, ছুটে এলুম বাইরে। পাশের দরজা পর্য্যন্ত যেতে হ'লো না, আমাদের সাড়া পেয়েই স্বয়ং তিনি বেরিয়ে এলেন—হাতে ঠিক আমার রাইটিং প্যাডটা।

আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করলে।

কোনো মানুষকে দেখে গায়ের উপর বমি করে' দিতে ইচ্ছে করে, এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা হ'লো। লোকটা দেখতে সুন্দর, সেই বিশেষ একরকমের সুন্দর, যার বিকৃতরূপ মনের গূঢ়তম বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে। পরণের স্যুট্‌টা ভালোই, মাথায় একটা ফেল্টহ্যাট বাঁকা করে' বসানো, বোতামের গর্ত্তে

একটা গোলাপফুল গোঁজা। সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পারছে না, ভক্‌ভক্ ক'রে' গন্ধ বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে। অনেকটা সার্কাসের ক্লাউনের মত, অত্যন্ত স্থূল হাস্যরসের একটা ছবি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি, একটা ব্যাঙের মত কি টিকটিকির মত—যাকে পায়ের নিচে মাড়াতেও ঘেন্না করে, দূরে থেকে যার গায়ে ঢিল ছুঁড়ে চোখ বুজে পালিয়ে যেতে হয়।

এই বীভৎস জীব আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, জড়িয়ে জড়িয়ে টেনে-টেনে বলতে লাগলো, 'Scuse me sah. Mah compliments of the season. I am a pooh man, y'see. Vehy pooh. Give a beggah a upee—' মাথা থেকে টুপিটা খুলে আমার সামনে ধরলো, 'Youh most' 'bedient sahv'nt.' দু'হাত বাড়িয়ে মাথা নিচু করলো, দেখা গেলো মাথার উপরকার ছোট, গোল টাক। 'You're the badshah—badshah—badshah—ha—ha!' অত্যন্ত শিথিল-ভাবে, দুর্ব্বলভাবে, ধিক্কারজনক মসৃণস্বরে লোকটা হেসে উঠলো।

আমার সমস্ত শরীর একদিকে যেমন ঘৃণায় সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠছিলো, তেমনি কোনো অদম্য অচেতন শক্তি আমাকে যেন ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিলো সামনের দিকে। আমি লোকটার দিকে একবার তাকালাম, তার ঢিলে, পুরু ঠোঁট নিচে ঝুলে পড়েছে, হাঁ-করা মুখটা একটা ক্লেদাক্ত গর্ত্তের মত। কী করছি বুঝতে

পারলুম না, ধাঁ করে' একটা বসিয়ে দিলুম ওর মুখের উপর। চীৎকার করে' লোকটা গোল হ'য়ে গড়িয়ে পড়ে' গেলো।

ছুটে নেমে এলেন চারতলা থেকে মিরজা সাহেব, ছুটে এলো ঢিলে ইজের পরা তাঁর পাঁচটা জোয়ান ছেলে, তাঁর দরোয়ান, তাঁর বাবুর্চি, বেরিয়ে এলো উল্টোদিকের দুটো ফ্ল্যাটের লোক—সবাই ঘিরে দাঁড়ালো, একসঙ্গে সবাই কথা বলতে লাগলো। তারপর সবাই একসঙ্গে চুপ করে' গেলো।

'মারুন, আরো মারুন, মেরে ফেলুন ওকে,' বলতে-বলতে একটি মেয়ে ছুটে এলো, হাঁটু গেড়ে বসে' পড়লো মাতালটার মুখের সামনে। এই শীতেও তার গায়ে শুধু পাৎলা একটা সেমিজ, লালচে জট-বাঁধা চুলগুলো পিঠের উপর ছড়ানো। আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলতে লাগলো, 'পারেন না আপনারা সবাই মিলে ওকে মেরে ফেলতে—এই যে, নিন্, মারুন, আমি কিছু বলবো না।' মেয়েটি বসে' পড়ে' অচেতন মাথাটা কোলের উপর তুলে নিলে। ও-রকম মুখ আমি কখনো দেখিনি। দীর্ঘ, অবিশ্রান্ত, অব্যক্ত যন্ত্রণায়, আর নিদারুণ ধৈর্য্যের আত্মপীড়নে একেবারে পাথর হ'য়ে গেছে, মুখোস হ'য়ে গেছে। শুধু চোখ দুটো জীবন্ত, উদ্দাম উজ্জ্বল চোখ, হাজার নিঃসঙ্গ রাত্রির নীরব অশ্রুপাতও সে-উজ্জ্বলতা মলিন করতে পারেনি। মেয়েটির বয়েস কুড়ি থেকে তিরিশের মধ্যে যে-কোনো একটা হ'তে পারে; দেখে মনে হয় কোনো নিষ্ঠুর

হাত তার সমস্ত যৌবন একসঙ্গে উপড়ে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে—এখন সে বয়েসের সীমার অতীত, সে যেন কখনো বুড়ো হবে না, কেনন যৌবন তার কখনো ছিলো না। আর তার কথাগুলো দ্রুত স্রোতে বেরিয়ে আসতে লাগলো, তার চোখের উদ্দাম দৃষ্টির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে—কিন্তু তার কণ্ঠস্বর অদ্ভুতরকম চাপা, সব সময়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে' কথা বলে'-বলে' তা যেন চিরকালের মত লুপ্ত হ'য়ে গেছে।

'জানি, জানি তো একদিন যে তুই মরবি, এমনি করে'ই মরবি—মরবার আগে আমাকে একেবারে শেষ করে' যাবি আর কি!' মেয়েটি সেই উৎকট গন্ধময় মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলতে লাগলো, 'শুনতে পাচ্ছিস? ছাই! এতক্ষণে কি আর হুঁস আছে—স্বর্গে অপ্সরীদের হাত ধরে' বেড়াচ্ছেন এতক্ষণে! আহা—নাক দিয়ে রক্তও গড়াচ্ছে যে, এই তো আছে আমার আঁচল, মুছিয়ে দিই প্রভুর পুণ্যমুখ। কেমন লাগে এখন—আমাকে মারবি, আর মারবি আমাকে! আর মেয়েমানুষের শরীর—সবই সয়, মারো, কাটো—মরে' না-গেলেই হ'লো। মরবো না রে, তোর মরণ না-দেখে আমি মরবো না। একদিন কোন্‌ ভাগাড়ে মরে' পড়ে' থাকবি—কেউ দয়া করে' ধড়টা আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়, তাহ'লেই হয়—এতদিন এত সইলুম, এখন ঐ মুখে আগুন না-দিয়েই কি মরবো!'

আমার পক্ষে কোনোরকম কোনো কথা বলাই তখন সম্ভব ছিলো না, অন্য কে-একজন বললে, 'চাকরটাকে ডাকুন ওঁকে ঘরের ভিতরে নিয়ে যাক্—'

'ও কপাল, আপনারা চাকরের আশায় আছেন বুঝি, চাকর তো চাকর—বাপ ভাই ছায়া দেখলে পালায়। প্রভুর জনম-মরণের এই এক দাসী দেখছেন, তা ছাড়া—' মেয়েটি হাত উল্টিয়ে চুপ করে' গেলো, তার শীর্ণ আঙুলে অনেকদিনের পুরোনো একটি আংটি চিকচিক করে' উঠলো।

একজন এগিয়ে এসে বললে, 'আপদি একটু সরুন, আমরা নিয়ে যাচ্ছি ভিতরে।'

. 'আর একদিন আপনাদের দয়া নিয়ে কী হবে—পনেরো বচ্ছর ধরে' এই করছি—কামাই নেই! খুব পারবো—জামা ধরে' হিড়্‌হিড়্‌ করে' টেনে নিয়ে যাবো মেঝের উপর দিয়ে, দেখুন না। প্রভুর এখন একেবারে তুরীয় অবস্থা, দেখছেন না! দিন, দিন্, ছটো-চারটে লাথি দিয়ে দিন্, যাঁর যা খুসি —আপশোষ রাখবেন না,। মদখোর মানুষ, কিছু মনে রাখবে না, কালই আবার হাসিমুখে গিয়ে আলাপ করবে। ফেলে রাখুন এখানে সমস্ত রাত, কিছু আপত্তি নেই, কত রাত ডাস্‌ট্‌বিনে নর্দ্দমায় কাটিয়ে এলো—এ তো স্বর্গ। ঐ ডাস্‌ট্‌বিনই শেষ আশ্রয়—কোনোখানে কি আর থাকতে পারবো একে নিয়ে—কুকুরের মত দূর-দূর করে' তাড়িয়ে দেবে না! আমারও

বাপ ছিলো, শ্বশুর ছিলো—ছিলো, দেখুন, অনেক-কিছুই তা ঠেকতে-ঠেকতে তো এই পর্য্যন্ত। বাপ কত খুসি হয়েছিলো—বিদ্বানের হাতে আমাকে দিলেন! মরেছে, আপদ্ গেছে। শ্বশুর বলতেন বৌমা, তুমি যদি পারো! ও-হো-হো—কী আহ্লাদের কথা! এই তো পনেরোদিন প্রভুর দেখা নেই—উধাও হ'য়ে গেলেন ট্যাক্সি চড়ে'—এদিকে আমি উপোস করে'ই মরি কি বিষ খেয়েই মরি। আরে মরবো না জানে—মরা কি এতই সহজ! মরে'ই যদি যাই, কার কাছে ও ফিরে আসবে! বাপ, মা, ভাই, বোন—এত কি আর কেউ সইবে! এই তো দেখুন—ঠিক ফিরে এসেছে আজ আমার কাছেই—যত রাজ্যের নোংরা মেয়েমানুষ ঘেঁটে, মদে সাঁতার কেটে—হাতে যা ছিলো ফুরিয়েছে আর কি! যাই এখন, সারা রাত বসে' বরফ চাপা দিই মাথায়—এই তো আমার কাজ।'

মেয়েটি উঠলো, আমরা কয়েকজন ধরাধরি করে' লোকটাকে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেলুম। মেয়েটি আসতে-আসতে বলতে লাগলো' 'অনেক কষ্ট দিলুম আপনাদের—তা মাতালের উপর রাগ করে'ই বা কী করবেন, বলুন! এই যে, এ-ঘরে আসুন। প্রভুর শয্যা প্রস্তুত করে'ই রেখেছি, এ-রকম একটা হবে, জানা কথাই। বেরিয়ে যাবেই সে, আমার গায়ে কতটুকু জোর, আমি কি ধরে' রাখতে পারি,

বলুন! এই যে, শুইয়ে দিন এখানে, মাথাটা উঁচু হ'লো বুঝি—এখন ধড়াচূড়োগুলো খুলে ফেলতে হয়—মাথায় রক্ত উঠেই না মরে!' মেয়েটি ক্ষিপ্রহাতে জুতো, মোজা, নেকটাই, কলার, কোট খুলে ফেললো, কোমরের বেল্টটা ঢিল করে' সার্টের বুকের বোতাম দুটো খুলে দিলে। নাকের নিচে একটুখানি রক্ত জমে' কালো হ'য়ে গিয়েছিলো, ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে ধুইয়ে দিলে। তারপর, কোত্থেকে মলমের কৌটো বা'র করে' ফাটা নাকটায় মালিশ করে' দিলে। বরফ আনানো হ'লো, মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়ে মেয়েটি হাতে পাখা নিয়ে বসলো শিয়রে। লোকটার চোখ বোজা, হাঁ-করা কুৎসিত মুখটা দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছে জোরে-জোরে।

'মণি, চাঁদের কণা, এবার ঘুমোও আর কি নিশ্চিন্ত হ'য়ে, আমি তো আছি সমস্ত রাত বসে'। মরতে পারলিনে, এতদিনেও তুই মরতে পারলিনে, হতভাগা? মর্, মর্ তুই—তোর মুখে-আগুন না-করে'ই কি আমি মরতে পারি! আপনারা যান্ এবার—দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে মজা দেখছেন নাকি—ওরে চাঁদের কণা, ওরে সোনা, ওরে মণি—মর্, মর্ তুই, মর্—'

শেষ